অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

—লেখকের—

বিনোদিনীর ডায়েরী ৪৲

রাজঘাট ৩৲

ল্যাম্পপোস্ট
যা' বলেছে

রাস্তার মোড়ের মাথায় ল্যাম্পপোস্টটা। বয়স হল' তার অনেক। কিন্তু সমানে দাঁড়িয়ে আছে সে আজও। প্রায় বারো ফুট লম্বা। মাথার চারদিকে কাঁচঢাকা লণ্ঠন—তারির ভেতর গ্যাসের বাতি সিল্কের ম্যাণ্টেল্ দিয়ে মোড়া। সন্ধ্যার আগে গ্যাস কোম্পানি থেকে লোক আসে। একটা বড় মই লাগিয়ে দেয় তার কাঁধে। টক্ টক্ করে উঠে যায় মইয়ের ধাপিতে ধাপিতে পা দিয়ে। ফস্ করে দেশলাই জ্বালে—অমনি দপ্ করে জ্বলে ওঠে গ্যাসের আলো। চারিধারে ছড়িয়ে পড়ে একটা সাদা দীপ্তি—অনেকটা যেন ঝর্ণার মত। তর্ তর্ করে নেমে আসে লোকটা মই বেয়ে বেয়ে—কাঁধে মইটা নিয়ে ছোটে আবার বাঁই বাঁই করে। গোধূলি লগ্নে মুখাগ্নি করে গেল যেন ল্যাম্পপোস্টটার। তারপর সেই আলো জ্বলবে—সারা রাত ধরে জ্বলবে—রাতের তমিস্রা ভেদ করে সে তার আলোর বাণ ছুঁড়বে। উঠবে না কোন শব্দ—জাগবে না কোন কোলাহল। আবার ভোর না হ'তে হ'তে লোকটা আসবে একটা কচি বাঁশের লগা নিয়ে—লগার মাথায় আঁটা একটা আঁকশির মত লোহার আংটা। তাই দিয়ে টান দেবে লণ্ঠনের নীচে একটা কি আছে তাইতে—আর অমনি ফস্ করে আলো যাবে নিবে।

সারাদিন ল্যাম্পপোস্টটা যেন ঝিমোয়—আর সারারাত যেন চোখ চেয়ে জেগে থাকে। দেখে সে অনেক কিছু—শোনেও অনেক। কিন্তু কিচ্ছু বলে না কাকোয়। ঠিক যেন বেদান্তের সাক্ষীস্বরূপ

কূটস্থ চৈতন্য। অমন করে দেখ্তে দেখ্তে শুন্তে শুন্তে ল্যাম্প-পোস্টটার সারা গায়ে কি যেন ব্যাধি হয়—চর্ম্মরোগ বোধ হয়—চক্‌লা চক্‌লা ছাল উঠতে থাকে। গ্যাস কোম্পানি খবর পেয়ে অমনি ডাক্তার পাঠায়। বড় বড় তুলি দিয়ে মাখিয়ে যায় গায়ে সবুজ রঙ্—বোধ হয় কন্দর্পসার তৈল্য। ফলে দু' একদিনের মধ্যেই ল্যাম্প-পোস্টটা আবার চেক্‌নাই দিয়ে ওঠে। রাতের বেলায় গায়ে তার হাত বুলোলে বেশ পাওয়া যায় স্নিগ্ধ পরশ—ঠিক যেন কালোমেয়ের অঙ্গ। অমন অনেকবার রঙ্ দিয়ে গেছে ল্যাম্পপোস্টে—বাতি বদলেছে—ম্যাণ্টেল্ বদলেছে। তবু আজও দেখলে মনে হয়, তার যৌবন যায় নি। মুখখানির দিকে তাকালে দুদণ্ড তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। আহা—কী শান্ত স্নিগ্ধ মধুর চাহনি! নিশ্চয় গ্যাস কোম্পানি ওর কায়কল্প চিকিৎসা করে যায় মাঝে মাঝে; নইলে এদ্দিন টেঁকে থাকে কি করে!

ল্যাম্পপোস্টের বয়স কি একটুখানি গা—অনেক অনেক বয়স। আমি তো হিসেব কষে' পাই নি। কুড়ি—পঁচিশ—তিরিশ—উঁহু! পঁয়ত্রিশ—চল্লিশ—উঁহু! পঞ্চাশ—পঞ্চান্ন—উঁহু! বলতে পারিনা বাপু—থামো। বয়স জেনে কি হবে? এ কি ফিল্ম্ স্টার না কি!

ঠিক রাস্তার মোড়ের মাথায় ল্যাম্পপোস্টটা দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে। রাস্তার নাম বলব না—বলতে নেই। কেন—অত কৌতূহল কেন রাস্তার নাম জানবার? রাস্তা রাস্তাই। বেশি লম্বা নয়—চওড়াও নয় বেশি। দু'খানা গাড়ী যাতায়াত করতে পারে। রাস্তাটা বেরিয়েছে একটা বড় রাস্তা থেকে—গিয়ে পড়েছেও ওদিকে আর একটা বড় রাস্তায়।

দেখ্লে—এই সেদিন ল্যাম্পপোস্টটায় নতুন রঙ্ দিয়ে গেল, আর অমনি এরির মধ্যে পান খেয়ে বাড়তি চূণটুকু আঙুলের ডগায়

নিয়ে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে পুঁছে গেছে! পোস্টার্ড মেরেছে যা' তা'—দিশি সাবানের—দাদের মলমের—মাথার আমলা তেলের! পুচ্ ক'রে পানের পিচ্ ফেলে একেবারে নোঙ্‌রা ক'রে দিয়েছে ল্যাম্পপোস্টের দেহটা—ছি-ছি-ছি। জ্বলন্ত বিড়ি-সিগারেট খানিকটা খেয়ে ওর গায়ে চেপে আগুন নিবোয় কেউ কেউ। আহা—ল্যাম্প-পোস্টটার লাগে না—ফোস্কা পড়ে না!

আহা—কত কষ্টই না এতকাল সহ্য করেছে নীরবে! একটা অতি সামান্য প্রতিবাদের সুর পর্য্যন্ত তোলে নি। ক'বছর আগে একদিন দুপুরে নির্জলা গ্রীষ্মে কোত্থেকে একটা ঘোড়া ছুটে এল ক্ষেপে। মারলে ধাক্কা সজোরে ল্যাম্পপোস্টটাকে। ল্যাম্পপোস্টটা অমনি হেলে গেল। কারোর ঘাড়ের ওপর পড়লো না। ছেলেরা কত টানা হ্যাঁচড়া করলে—একেবারে রা কাড়লে না। গ্যাস কোম্পানির লোক খবর পেয়ে ছুটে এল। আবার মাটি খুঁড়ে বসিয়ে দিয়ে গেল ঠিক ক'রে।

মোড়ের মাথায় বনমালী শিকদার বাড়ি তুললে। ল্যাম্পপোস্টের ধার পর্য্যন্ত এলো তার গাড়ী-বারান্দা। যুদ্ধের বাজারে ধূলোমুঠি ধ'রে সোনামুঠি করেছে। দেমাক কত! কি ছিল অবস্থা! ঐখানেই তো সামনে টিন-ছাওয়া আর ভেতরে ভাঙা কোঠা ঘর ক'খানা ছিল বনমালী শিকদারের। ব'নে গেল একেবারে গরীব থেকে রাজা—ফকির থেকে আমির! শিকদার বাড়ির অনেক কথা জানে ল্যাম্প-পোস্টটা। সে যে সব দেখেছে স্বচক্ষে। গাড়ী-বারান্দা করতে গিয়ে একখানা এগারো ইঞ্চি থান ইট ঠিকরে পড়লো ল্যাম্পপোস্টটার মাথায়। মাথা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ভাঙা কাঁচে তলাটা ছড়িয়ে পড়লো। একটা কথা বলে নি তবু! কত চেষ্টা করেছিল বনমালী শিকদার ল্যাম্পপোস্টটা তুলে দেবার জন্যে। আঘাত

পর্য্যন্ত করলে মাথায়। যেন আগের-কথা-জানা জিনিষ রাখবে না চোখের সামনে। সরিয়ে দেবে তা'র যেন ত্রিসীমানা হ'তে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারলে কি! ল্যাম্পপোস্টটা আবার তুলে ধরলে তা'র মাথা। চোখ চেয়ে চেয়ে নির্বাকে দেখতে লাগলো বনমালী শিকদারের ঘরের মধ্যে—কি হচ্ছে না হচ্ছে। অমন হয়ে গেছে তো অনেক। জানে সব ল্যাম্পপোস্টটা।

আর ঘেঁটিও না বাপু! শ্রীনাথ—শ্রীনাথ ময়রা গো—পাড়ার শ্রীনাথ ময়রা—খাবার দোকান করেছিল ঐ চৌমাথার মোড়ে। সকাল বেলা ছোট ছোট কড়াই ডালের ফুলো ফুলো কচুরি ভাজতো —এক পয়সার একখানা—তারির সঙ্গে দিত শালপাতার মধ্যে এক চামচ হালুয়া—সুজির হালুয়া—আটা-ময়দার নয়। কী বিক্রিই না হ'তো যুদ্ধের আগে! বেশ ছোট গোছানো সংসার শ্রীনাথ ময়রার। দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী বৌ—একেবারে কচি—হালিসহর থেকে বিয়ে করে আনলে। বনমালী শিকদারের বাড়ির পাশেই শ্রীনাথ ময়রার বাড়ি। যুদ্ধের বাজারে টান পড়লো সব। শ্রীনাথ ময়রা আটা পায় না —কচুরি বানাবে কি দিয়ে! হাত গুটিয়ে ব'সলো শ্রীনাথ। বনমালী শিকদারের তখন বাড়্‌বাড়ন্ত। পানাগড়ের মিলিটারী ছাউনিতে রসদ জোগান দিত। মা লক্ষ্মী কৃপা করেছিলেন বনমালীকে। নইলে কি আর সে অত বাড়্‌ বাড়তে পারতো! শ্রীনাথ এসে বনমালী শিকদারের পায়ে ধরলে—ক'মণ আটা যদি তা'কে কিনিয়ে দেয় ন্যায্য দামে। সে-কথা শোনে নি বনমালী শিকদার। তখন চলছে তার একাদশ বৃহস্পতি। তারপর—তারপর কোথায় গেল সেই শ্রীনাথ ময়রার সুন্দরী বৌ প্রমীলা? কন্‌কনে শীতের রাতে একখানা সবুজ রঙের নতুন আলোয়ানে অঙ্গ মুড়ে তাড়াতাড়ি এসে উঠলো এই ল্যাম্প পোস্টের ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা একখানা মোটর গাড়ীতে। গাড়ীর

ভেতর বসে আছে বনমালী শিকদার। পাঞ্জাবী ড্রাইভার—আরও দু'জন লোক ড্রাইভারের পাশে। প্রমীলা গাড়ীতে এসে উঠতেই গাড়ী দিলে ছেড়ে। এ ব্যাপার তো ল্যাম্পপোস্টটা স্বচক্ষে দেখেছে। কারোয় বলেছে কি? পরের দিন যখন পাড়ায় ঢি-ঢি পড়ে গেল— বনমালী শিকদার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে মুখে চুরুট টানতে টানতে এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছেই পায়চারি করছিল আর সাধুগিরি ফলাচ্ছিল—সে কথাও জানে সে। কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকোলে বৌটাকে। ধব্‌ধবে গায়ের রঙ—টানা টানা চোখ—বেশ পুষ্ট গঠন— এতটা সৌন্দর্য্য কোথায় গিয়ে কি দিয়ে ঢেকে রাখলে বনমালী সেই মাঘ মাসের কন্‌কনে শীতের রাতে—সে কথা ল্যাম্পপোস্টটা জানে না। আহা—ও তো পিছু পিছু ছুটে গিয়ে দেখে আসতে পারে নি। ওর পা যে বাঁধা—মাটিতে পোঁতা। কিন্তু এটা জানে—দেখেছে চোখ চেয়ে প্যাট্‌ প্যাট্‌ করে—শ্রীনাথ ময়রার দ্বিতীয় পক্ষের বৌ প্রমীলাকে তার সামনেই মটরে হাত ধরে তুললে বনমালী শিকদার।

এর এক বছর পরেই বাড়ী তুললে বনমালী। থান ইট্‌ মেরে মাথা ভাঙলে ল্যাম্পপোস্টের—তা আর মারবে না!

তারপর কি হল' শ্রীনাথ ময়রার? একথা আর ল্যাম্পপোস্ট বলবে কি? পাড়ার সকলেই তো জানে। তার বসত বাড়ী বেশি দাম দিয়ে কিনে নিলে বনমালী। নিজের ভদ্রাসনের মাপ গেল বেড়ে।

পাঁচখানা ঠেলা গাড়ী এসেছিল। এই ল্যাম্পপোস্টের ধারেই সেগুলো দাঁড় করালে শ্রীনাথ ময়রা। জিনিষপত্র হাঁড়ি-কুঁড়ি ডেও-ঢাকনা সব চাপালে ঠেলা গাড়ীর ওপর। তারপর আগের পক্ষের একটি মেয়ে আর এপক্ষের একটি ছোট ছেলের হাত ধরে চোখ মুছতে মুছতে চলল ঠেলা গাড়ীগুলোর পিছন পিছন। বনমালী

শিকদার ঢিলে পায়জামা ও ডোরা কাটা বুস্ সার্ট পরে মুখে চুরুট ধরিয়ে ঘরের জানলা থেকে দেখছিল তাদের। আর ল্যাম্পপোস্টটা দেখছিল সেদিন ঐ অমনি ভাবে নিঃসাড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বনমালী শিকদারকে।

এ ল্যাম্পপোস্ট আজকের নয়—বলেছি ত অনেক দিনের। ইচ্ছে করলে সে বলতে পারে পাড়ার মহাভারত। সন্ধ্যার পর প্রায়ই তার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াই। গায়ে হাত বুলুই। বিড়ি ধরাই আর টানি। চেয়ে দেখি তার আলোর দিকে। কি যেন একটা আজকাল বলে বলে যায় খুব ধীর শান্ত মৃদু ভাষায়। কান পেতে শুনি তা'। ল্যাম্পপোস্টের কি ভাষা আছে? আছে গো আছে—নইলে আমি শুনছি বুঝছি কি করে!

বনমালী শিকদারের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে একটা যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে ল্যাম্পপোস্টটা। শ্রীনাথ ময়রার নাম এখন আর কেউ করে না পাড়ায়। কেনই বা করবে? বৌ যার বেরিয়ে যায় তার নাম আবার কে করে! এখন নাম করে বনমালী শিকদারের। কী বাড়ী—কী গাড়ী—কী পয়সা! বনমালী শিকদারের বয়স এখন প্রায় চল্লিশ—আড়া ভালো। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। অগাধ টাকার মালিক হয়ে কাপড় পরা ছেড়েই দিয়েছে। ঢিলে পায়জামা পরে বাড়ীতে—বাইরে বেরুতে গেলে স্যুট্। অনেক সাহেব সুবোর সঙ্গে মিশতে হয়, বড় বড় পার্টিতে যেতে হয়—কাছায় কোঁচায় কেমন বেখাপ্পা মানায়। বাড়ী হাঁকড়েছে কি! যেন রাজপ্রাসাদ—আগা-

গোড়া মার্ব্বেল পাথর বিছানো। সদর দরজায় দু'জন দরোয়ান—পালা করে দিনরাত ফটকে খাড়া থাকে। বাইরের কোন লোকের হুট্ বলতে বাড়ীর ভেতর ঢোকবার উপায় নেই—সে পুরুষই হোক্ আর মেয়েমানুষই হোক্। পয়সা যখন ছিল না, তখন বনমালী শিকদার বিড়ি টানতো পাড়ার কুঞ্জ মাতালের সঙ্গে। এখন বিড়িতে ঘৃণা; আদর দামী সিগারেটে—কদর চুরুটে।

এই তো সেদিন—ক' বছরই বা হবে—ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে বনমালী শিকদার ও কুঞ্জ মাতাল দু'জনে বিড়ি ফুঁকছিল আর চেয়ে চেয়ে দেখছিল সামনের বাড়ীর দোতলার বারান্দার দিকে। বোসেদের বাড়ী—নিবারণ বোস। নাম ডাক ছিল—এখনও আছে। কোন্ একটা অফিসের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন নিবারণ বোস। পয়সা করেছিলেন খুব। জমিদারি কিনেছিলেন। বেশ বনেদি ঘর। এখন সে-ঘর গেছে ভেঙে। নিবারণ বোস বেঁচে নেই। তিন পুরুষে সব যেন নয়-ছয় হয়ে গেল। বাড়ী হলো শ্রীহীন। ভেঙে পড়লো প্রকাণ্ড ঠাকুর দালান। বারো শরিকে ভাগ হয়ে গেল অত বড় বোসেদের বাড়ী—নিবারণ বোসের বাড়ী। যে পেরেছে পাঁচিল তুলেছে। যে পারেনি সীমানা সামলেছে চেঁচাড়ির দরমা দিয়ে। দেয়াল থেকে খসে খসে পড়ছে চূণ বালি; খাদি খাদি ইট্ দেখা যাচ্ছে। বারান্দার সেই বাহারি রেলিঙ্ গেছে উড়ে। সরু সরু বাঁশ বেঁধে রেখেছে বিপদকে ঠেকাতে। কেউ কেউ আবার ভাড়া বসিয়েছে ঘর ঘর। একতলার ঘরগুলো নীচু নীচু; কালে কালে সরকারী রাস্তা হয়েছে উঁচু উঁচু। বাড়ীতে ঢুকতে গেলে এখন রাস্তা থেকে দু'ধাপ নেমে ঢুকতে হয়। বর্ষাকালে রাস্তার জল হু-হু করে ঢোকে বাড়ীর মধ্যে। উপায় কি! ঠেকাবে কিসে? তরল ভাঙনের গতিমুখ রুধবে কি দিয়ে! বাড়ীর পাশ দিয়ে রাস্তার

ওপর চলে গেলে নাকে এসে লাগে একটা নোঙ্‌রা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। নাক চাপা দিতে হয় তা’তে।

বারো শরিকে ভাগ হয়েছে এখন নিবারণ বোসের বাড়ী। প্রায় দেড় কাঠা করে জমি পড়েছে প্রত্যেকের ভাগে। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে অনেক নরনারী। ঠিক যেন একটা বোলতার চাক্‌—একেবারে থুক্‌ থুক্‌ করছে যেন বোলতাতে। বাড়ীর ড্রেনে পাঁক জমেছে অনেক—ঘরে ঘরে মনে মনে ময়লা খুব। দিনরাত ঝগড়া-ঝাঁটি হাতাহাতি কোথাও না কোথাও লেগেই আছে। স্থানীয় থানার ইন্‌স্‌পেক্‌টর এদের ডায়েরী লিখে লিখে এলে গেছে। গেলে স্পষ্টই বলে দেয়, আর ডায়েরী লেখাতে হবে না। কোর্টে নালিশ করে দাও গে। কিন্তু কেউ আদালত-ঘর করে না। সুমতি আছে—বলতেই হবে।

লক্ষ্মী যখন চলে যান বাড়ী থেকে, বসিয়ে যান বাড়ীতে অলক্ষ্মীকে। চলে তখন অলক্ষ্মীর রাজত্ব। হল’ও তাই বোস বাড়ীতে। কে কার খোঁজ রাখে! সদ্যপ্রসূত সাত মাসের মরা শিশু ফেলে গেল রাতারাতি এই ল্যাম্পপোস্টের কাছে একটা অন্ধকার ঘোঁজের মধ্যে একেবারে কাঁচারক্তমাখা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়িয়ে। নিষুতি রাত—জেগে নেই কেউ। শুধু জ্বলছে ল্যাম্পপোস্টের আলোটা। সেদিন গ্যাসের ম্যাণ্টেল্‌টা গেছল আবার খারাপ হয়ে। সন্ধ্যার পর থেকেই দপ্‌ দপ্‌ ক’রে একবার জ্বলছিল আর নিবছিল। জানান দিচ্ছিল বুঝি! সে-ইঙ্গিত কেউ তো বুঝতে পারে নি। সারারাত অমনি করে দেখেছে ল্যাম্পপোস্টটা সমস্ত কাণ্ডকারখানা। রাত তখন একটা দেড়টা হবে। একজন ঝিয়ের মত মেয়েমানুষ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বোস বাড়ী থেকে পেটকাপড়ে কি একটা গুছিয়ে নিয়ে। দরজার চৌকাটে দাঁড়িয়ে চোরের মত দেখতে

লাগল এদিক ওদিক। তারপর চলে যাচ্ছিল তাড়াতাড়ি রাস্তা দিয়ে। কিসের যেন শব্দ পেলে—ভয় খেয়ে গেল অমনি। পেটকাপড় থেকে বোঁচকাটা বার ক'রে আধো-আলো-আধো-আঁধার ঐ ঘোঁজটার দিকে চকিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। কেমন যেন থর্-থর্ করে হাত দু'টো কাঁপছিল তার। দপ্-দপ্ করে জ্বলছিল ল্যাম্প-পোস্টের আলোটা—শব্দ হচ্ছিল ফট্-ফট্ করে। আর দাঁড়ালো না ঝিটা। দৌড়ে ঢুকে গেল বোসবাড়ীর মধ্যে।

তারপর—তারপর সেই কাঁচারক্ত ও নরম মাংসের গন্ধ উঠল বাতাসে ভেসে। কোথায় ঘুরছিল দুটো লেড়ি কুকুর। কে যেন টেলিগ্রাম্ করলে তাদের। ছুটে এল গন্ধ পেয়ে। ঘেউ ঘেউ করতে করতে টেনে ছিঁড়ে কামড়ে রগ্ড়ে বোঁচকাটা ঘোঁজ থেকে এনে ফেললে এই ল্যাম্পপোস্টটার তলায়। হ্যাঁগো—এই ল্যাম্পপোস্টটার তলায়। তারপর দু'টো পশুতে মিলে সেই বোঁচকাটা নিয়ে টানাটানি কামড়া কামড়ি। রক্তমাখা ছেঁড়া ন্যাকরাটা একেবারে লম্বা করে মেলিয়ে ধরলে রাস্তার ওপর। খুলে গেল বোঁচকার বাঁধন। প্রকাশ পেল এক সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহ। তাই দেখে যেন ল্যাম্পপোস্টটা ফট্ করে একবার আওয়াজ করে দপ্ করে সে-রাতের মত শেষবার আলো দিয়ে আপনি গেল নিবে। ঘন আঁধারে সারা রাস্তাটা গেল ডুবে। ভোর হতে বেশি দেরি ছিল না—ধীরে ধীরে বইছিল ভোরের হাওয়া।

তারপর—তারপর ভোর হল'—সকাল হল'। জড় হল' লোকজন। পড়ে গেল হৈ-হৈ। এল পুলিশ, এল ডোম—নিয়ে গেল তুলে সেই ন্যাকড়া জড়িয়ে মরা শিশুর দেহটা।

হ্যাঁগো—সত্যি! অত কথায় কাজ কি; এই তো সেদিন আবার —না থাক্গে।

তাই বলছিলুম—অনেক কাহিনী জানা আছে ল্যাম্পপোস্টের। কারোয় কি কিছু বলেছে সে? পুলিশের লোক এসে কত তো করে গেল তল্লাশি—প্রকাশ পেল কি কিছু? জিজ্ঞেস করেছিল কি ল্যাম্পপোস্টকে? তা কেন করবে! তার চেয়ে সাবান তেলের পোস্টার্ড মারবে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে, পুচ্ করে এক গাল দোক্তা-চিবোন পানের পিচ্ ফেলবে গা' ভাসিয়ে, জুতোর নরম কাদা পুঁছবে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে রগ্ড়ে রগ্ড়ে ল্যাম্পপোস্টের গোড়ায়। কোন্ বিধবার গর্ভপাত করে মরা শিশুর দেহ রাস্তার কানাচে ছেঁড়া ন্যাকরা জড়িয়ে ফেলে দিয়ে আসে, সে কথা তো কেউ জানে না—জানে এই ল্যাম্পপোস্টটা। আমি যে শুনেছি তার কাছে কিছু কিছু। সে যে দেখেছে বোস বাড়ীর ছাতে এলো চুলে ঘুরে বেড়াতে সেই বিধবাটিকে। ছাতের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতো উঁকি মেরে। ল্যাম্পপোস্ট দেখতে পেত' তাকে—আর অমনি তার মনে পড়ে যেত সেই বিগত এক নিষুতি রাতের কথা। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠত এক নিরপরাধ করুণ শিশুর ব্যথা!

এই দেখ—কি বলতে গিয়ে কি কথা ফেল্ছি বলে।

হ্যাঁ—এই তো সেদিন—ক'বছরই বা হবে—ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে বনমালী শিকদার ও কুঞ্জ মাতাল দু'জনে বিড়ি ফুঁকছিল আর চেয়ে চেয়ে দেখ্ছিল বোসেদের বাড়ীর দোতলার বারান্দার দিকে। বারান্দা দেখে নি। সরু সরু বাঁশবাঁধা বারান্দা—দেখবে কি তার—দেখবার কি তার আছে! দেখছিল তারা সুধাকে—নগেন বসুর মেয়ে সুধাকে। কি দরকারে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল সে। কলেজে পড়ে সুধা। বয়স হবে কুড়ি। ঢল-ঢল যৌবন টল-মল করছে যেন তার দেহপাত্রে। নিষ্ঠুর দারিদ্র্য যতটা

পেরেছে দাবিয়ে রেখেছে তার রূপপুষ্টি। একেবারে পিষে দিতে পারে নি তার বিকাশ। তা কি পারে কেউ?

তারপর কুঞ্জ মাতাল নীচের ঠোঁটটা বাঁ হাতে একটু টেনে একটা চোঁ করে শিস্ দিয়ে উঠল। মুচকে হাসলে বনমালী। সুধা আর দাঁড়ালো না বারান্দায়। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর।

বনমালী বলেছিল তখন আক্ষেপের সুরে, যাঃ—মাইরি—কি কর্‌লি বল্ দেখি, কুঞ্জ।

—গালফুলো পায়রা ওড়ালুম।

এই বলে কুঞ্জ হো-হো করে হেসে উঠ্‌ল।

সুধা কলেজ যেত রোজ বই খাতা নিয়ে। রাস্তার কোন দিকে তাকাতো না। সঙ্গেও তার থাকতো না কেউ। পাড়াটা পার হত' বেশ জোরে জোরে পা ফেলে। ল্যাম্পপোস্টটার পাশ দিয়েই সে গিয়ে পড়ত বড় রাস্তাটার ওপর। কতদিন তার শাড়ীর মৃদু পরশ লেগেছে ল্যাম্পপোস্টটার গায়ে—বেশ স্নিগ্ধ পরশ! একটা আল্‌তো দোলা হয়তো তাতে জেগেছিল—কিংবা হয়তো জাগেও নি। পাড়ার ছেলেরা বলতো, মেয়েটার কি দেমাক—কি অহঙ্কার! ফুট্ কাট্‌তো অমন অনেকে। শুনতে পেত' সুধা—গ্রাহ্য করত না কিন্তু।

বোস বাড়ীর অনেকে অনেক কথা বলতো সুধার বিধবা মাকে, আর কেন বাপু—নেকাপড়া শিখিয়ে আর কি হবে! অত বড় ধাড়ি মেয়ে—মেয়ের বিয়ে তো দিতে হবে।

সুধার মা বলতো, মেয়ের বিয়ে আমায় দিতে হবে না। মেয়ে আমার নিজে দেখেশুনে বিয়ে করবে'খন।

—ও মা—বল' কি—সে কি কথা!

গালে হাত দিত সকলে সুধার মায়ের বাক্যি শুনে। আর গাল পাড়তো একটু অন্তঃরালে গিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা চলতো নোঙ্‌রা সুধাকে নিয়ে। তার কতক কতক ভেসে আসতো সুধার মায়ের কানে। মনটা যেত কুঁচকে। বেশ একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়তো সুধার মা। বুঝতে পারতো সুধা। বলতো তার মাকে, এখন কথা শোনবার দিন আমাদের, মা—তুমি এখন খালি শুনেই যাও। বল' না যেন কিছু। বলবার দিন এলে—

বাধা দিয়ে সুধার মা জিজ্ঞেস করত, তুই কি সত্যিই জীবনে বিয়ে করবি না, সুধা?

সুধা বলতো, দেখ' মা—জন্ম মৃত্যু বিয়ে এ তিন কপাল নিয়ে। তখন তুমি ওসব কেন ভাবো বল তো।

সুধার বাপ সাত বছর মারা গেছে। সুধা তখন স্কুলে পড়তো—যেদিন তার বাপ শেষ নিশ্বাস ফেললে। সংসারে রইল তিনটি প্রাণী—সুধার মা, সুধা আর সুধার এক ছোট ভাই। বাপের বড় ইচ্ছে ছিল, সুধা যেন ভালো করে লেখাপড়া শেখে। সুধার মাকে বলেওছিল—সুধার লেখাপড়া যেন ছাড়িয়ে দেওয়া না হয়। তেমন করে ছাড়াবার দরকারও হয় নি। লাইফ্‌ ইন্‌সিওরের কিছু টাকা সুধার মায়ের হাতে এল আর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সুধার মেধা ও প্রতিভা।

পৈতৃক বাড়ী—অংশ ভাগ করে নিয়েছিল সুধার বাপ। ভাড়া লাগে না তাই। খুব কষ্টে চলতো সুধার মা; আর খুব বুঝে চলতো সুধা। আই-এ পাশ করে একটি বড় লোকের মেয়েকে বাড়ী গিয়ে

পড়িয়ে আসতো সুধা সন্ধ্যার পর। পেত' তিরিশ টাকা মাসে। অনেকটা আসান হয়েছিল তাতে সংসারে। কাজটা জুটিয়ে দিয়েছিল পরিমল বাবু—সুধাদের ভাড়াটে; থাকতো বোস বাড়ীতে সুধাদের অংশের একতলায় তিনখানা ঘরে সপরিবারে।

সুধার ছোট ভাই কনক বোস। বেশ ফিট্‌ফাট্ চেহারা। দেখতে একেবারে যেন কার্ত্তিকটি। লেখাপড়ায় মন নেই। ম্যাট্রিক পাশটা আর কিছুতেই করতে পারছে না। চেষ্টা করলে ছ'বার—একবার পরীক্ষা দিয়ে আর একবার না দিয়ে। কিন্তু ফল হলো না কিছু। সুধাই তাকে পড়াতো—এখনও পড়ায়। শেষ চেষ্টা একবার দেখ্‌ছে। কিন্তু দেখলে হবে কি—কনক দেখবার বাইরে। তার মন পড়ে থাকে খেলার মাঠে—সিনেমা হাউসে। সুধার ওসব বালাই নেই। কনককে সুধা বকে-ঝকে; ভাইবোনে ঠোকাঠুক্কি হয়—থামায় মা এসে।

সুধার মায়ের শাসনে নোল খুব, কিন্তু টান বড় সুধার শাসনে। কনক তাই সুধাকে মনে মনে ভয় করত বেশ। এমন অনেকবার হয়েছে, সুধা আপন মনে কনককে পড়িয়ে যাচ্ছে—কনক রয়েছে অন্যমনস্ক হয়ে। ছ'বার ধমক দিলে। শেষে দিলে কনকের মাথাটা দেয়ালে ঠুকে। সেইজন্যে দিদির কাছে পড়তে বসে কনক যতটা না বই খাতার দিকে নজর রাখতো তার বেশি নজর রাখতো নিজের মাথাটার দিকে।

এইতো সেদিন ছাত্রীকে পড়িয়ে সুধা রাত ন'টার সময় বাড়ী ফিরলো। মায়ের মুখে শুনলো কনক সন্ধ্যে থেকেই বাড়ী ঢোকে নি। গুম্ হয়ে রাস্তার ধারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি দেখলে আর কি যেন ভাবলে সুধা। তারপর তর্‌তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সুধা। বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। চললো সোজা বাড়ীর

পশ্চিম দিকে। ৬নং বাড়ীতে ক্লাব্ ঘর—পাড়ার থিয়েটার ক্লাব্। ছেলেরা অভিনয় করবে শীগ্গীর—তারির মহলা চলছে সেখানে পূর্ণ উদ্যমে। কনক ভিড়েছে সেই দলে—বহুদিন ভিড়েছে। সুধা জানতো তা'। বরাবর ক্লাব্ ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বেশ চড়া গলায় ডাকতে লাগল সুধা 'কনক—কনক' ব'লে। একটা কোমল শিহরণ খেলে গেল ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত। একটা কেমন যেন আমেজি দোলা লাগলো সকলের বুকে। কনক নারী-ভূমিকায় অভিনয় করবে। মহলা দিচ্ছিল তার সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সুধার ডাক শুনে সে থপ্ করে বসে পড়ল। যেন আপনাকে লুকোতে চায় সকলের মধ্যে ডুব দিয়ে।

সুধা আবার ডাকলে, কনক—চলে এস বাইরে।

'ম্লান মুখে বেরিয়ে এল কনক। কাছে এসে দাঁড়াতেই সুধা বললে, বাড়ী চল'—মা ডাকছে।

আর দাঁড়ালো না সুধা। ক্লাব্ঘর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। হল' বাড়ীমুখো। কনক পিছু পিছু চললো সুধার। ছেলেদের অভিনয় ঘরের মধ্য থেকে জমলো বেশি ঘরের বাইরে। সুধার পার্টটা সেদিন ভালোই হয়েছিল।

বাড়ীর দরজার নিকট এসেই ঘুরে দাঁড়ালো সুধা। চোখ পাকিয়ে চাইলে কনকের দিকে। একেবারে যেন সুধার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। বেশ তীব্র কণ্ঠে বললে, আবার তুই থিয়েটার দলে গিয়ে ভিড়িছিস্—তোকে না সেদিন পই-পই নিষেধ করেছিলুম।

বলেই সুধা ঠাস্ করে কনকের গালে মারলে একটা চড়্। রাগে দুঃখে বেদনায় সুধার যেন সর্ব্ব শরীর ফুলছিল—ফুটছিল যেন রক্ত টগ্-বগ্ করে।

কনক কিছু বলতে পারলে না সুধার মুখের ওপর। মুখখানা গোঁজ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চলে গেল মায়ের কাছে।

ভাই বোনের কাণ্ডকারখানা সমস্তই সেদিন দেখেছিল ল্যাম্পপোস্টটা। সুধার সিঁদুরবর্ণ মুখখানা দেখে একটু ভয়ও যেন হয়েছিল তার। কখনও দেখেনি সুধার রাগ। সুধা যে কোনদিন অমন করে রাগের মাথায় উপযুক্ত ছোট ভা'য়ের গালে ঠাস্ করে চড়িয়ে দেবে বা দিতে পারবে—একথা ভাবতেও পারেনি কখনও সে।

ওপরে উঠে গেল সুধা। বাইরের কাপড় জামা ছাড়লে। সুধার মা শুয়ে আছে বিছানার ওপর রুগ্ন দেহখানা সঁপে দিয়ে। আজ তিন মাস হল' সুধার মা ভুগছে নানা অসুখে—মেয়েলি অসুখ। যথাসাধ্য চিকিৎসা করাচ্ছে তার সুধা। মাঝে মাঝে কখনও একটু ভালো থাকে—আবার কখনও মোটেই থাকে না ভালো। ঘর সংসারের কাজ রান্নাবান্না একা সুধাই করে। এর ওপর আবার মায়ের সেবা শুশ্রূষা আছে। সুধা ক্লান্তি বোধ করে না কিছু।

স্টোভ্‌টা জ্বেলে রাতের খাবার তৈরি করতে বসলো সুধা রান্নার উপকরণ সব গুছিয়ে নিয়ে।

সুধার মা বললে, অত বড় ছেলেটাকে মারলি কেন?

—না—মারবে না—আদর করতে হবে। মা, তুমি চুপ কর'—তোমার ঐ একটানা আশকারা পেয়ে কনক একেবারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে—তা' জানো। এই বলে একটা মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সুধা।

সুধার মা বললে, কনক রাগ করে কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে শুতে চলে গেল। কিছু রাতে খাবে না—বলে গেছে।

—না খায় না খাবে। খোসামোদ তোমায় করতে হবে না। তুমি যেমন শুয়ে আছ—শুয়ে থাকো।

মাকে দাবড়ে দিলে সুধা। ভয়ে সুধার মা আর কিছু বললে না, চুপ করে রইল।

এই সুধা—যাকে দেখে এই ক'বছর আগে কুঞ্জ মাতাল ঠোঁট চেপে শিস্ দিয়ে উঠেছিল বিশ্রী—কুশ্রী হেসেছিল বনমালী। সেদিন দেখেছিল শুনেছিল তা' সব এই ল্যাম্পপোস্টটা। আর আমি শুনেছিলুম এই ল্যাম্পপোস্টটারই কাছে।

এ পাড়ার খবর কোনটাই বা তার অজানা ! ঐ যে পরিমল বাবু ছিল—সুধাদের ভাড়াটে—বেশ লোকটি। দু'বার এম,এ পাশ করেছে। স্কুল মাষ্টারী করে—ছেলে পড়ায়। অনেকদিন এ পাড়ায় ছিল। শিক্ষার বিনয় ও শিক্ষার তেজ দু'টোই পরিমলবাবু দুহাতে মুঠো করে যেন বেড়াতো। কলকাতার মেসে থেকে লেখাপড়া শিখেছে। বাপ মা মারা গেছেন তার খুব অল্প বয়সে। পল্লীগ্রামের ছেলে—দেশ শান্তিপুরে। বিয়ে করেছে। পরিবার আর তিনটি ছেলে মেয়ে পোষ্য। পরিমলবাবুর শরীরের গঠন ভালো। বেশ সুস্থ স্বাস্থ্য। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। সুধার মাকে মাসী বলে ডাকে। পরিমলবাবুর পাণ্ডিত্য খুব—মনীষায় ধার আছে। ইংরিজি ও বাঙলায় এম্-এ। মিল্টনের Paradise Lost এর প্রথম দু' Canto একেবারে গড়্ গড়্ করে মুখস্থ বলে যেতে পারে। মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যখানা একেবারে আগাগোড়া প্রায় কণ্ঠস্থ। সুধা দরকার পড়লে মাঝে মাঝে পড়া বুঝে নেয় পরিমল বাবুর কাছ থেকে। বেশ চমৎকার পড়ায় পরিমলবাবু। জীবনের

প্রথম ভাগে শিক্ষা অর্জ্জনে যেমন সামান্যমাত্র অবহেলা করে নি—ঠিক তেমনি তার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য ছিল না শিক্ষা বিতরণে। পরিমলবাবুর বেশভূষা অতি সাধারণ। সেদিকটা ভাববার তার যেমন খেয়ালও নেই, সময়ও নেই তেমনি। দিবারাত্র বইই তার সঙ্গী। নীরস শুষ্ক পুঁথির পাতায় কি মধুর সন্ধান পেয়েছে, তা জানে এক পরিমলবাবু। পাড়ার অনেকেই তাকে ডাকতো পাগ্‌লা মাষ্টার বলে। তা' শুনে একটু মৃদু হেসে কথাটা একেবারে হাল্কা ফিকে করে দিয়ে যেন বাতাসে উড়িয়ে দিত পরিমলবাবু।

ল্যাম্পপোস্টটা জানে একদিন কি হয়েছিল। রাত তখন প্রায় একটা। পরিমলবাবুর স্ত্রী শুয়ে আছে ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে। ঘুমের সময় চোখের সামনে আলো জ্বললে ঘুমের বড় ব্যাঘাত হয়। সহ্য করতে পারে না তা' পরিমলবাবুর স্ত্রী তরুবালা। বড় বকাবকি আরম্ভ করে দেয়। সেই ভয়ে পরিমলবাবু রাত্রে পড়াশোনা বড় একটা করতে পারে না। সেদিন রাত্রে কি জানি কেমন একটা অদম্য স্পৃহা জাগলো অধ্যয়নের। পরিমলবাবু চুপিসাড়ে হ্যারিকেনটা জ্বেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতে একখানা মোটা বই। সুধাদের ঘরের সামনে বারান্দার এক কোণে ওপরে ওঠবার সিঁড়ির একটি ধাপিতে চুপটি করে বসে বই পড়তে লাগলো। একেবারে নিষুতি রাত—সারা বোস বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ। ঘরে ঘরে নাক ডাকার আওয়াজ উঠছে। ভ্রূক্ষেপ নেই কোন পরিমলবাবুর। সাধনায় একেবারে যেন ডুবে গেছে—হারিয়ে ফেলেছে নিজের সম্পূর্ণ সত্তা।

ওদিকে এই ল্যাম্পপোস্টটার মাথায় আলো জ্বলছে। তারির খানিকটা আভা এসে পড়েছে সুধাদের বারান্দার ওপর। গ্রীষ্মকাল—গরম খুব গেছে দিনের বেলায়। সন্ধ্যার পর থেকে হাওয়া বইছে

বেশ জোরে। ঘরের মধ্যে সুধার ঘুম নেই। আসছিল না ঘুম সেদিন কে জানে কেন! বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সুধা। এক গেলাস জল খেলে ঢক্-ঢক্ করে। তারপর কি মন গেল ঘরের দরজা খুলে রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সুধা। কেমন চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল হঠাৎ ঐ অবস্থায় বারান্দার এক ধারে আলো জ্বেলে একটা মানুষকে বসে থাকতে দেখে। কিন্তু থেমে গেল পরক্ষণেই। বুঝতে পারলে, অচেনা মানুষ নয়—পরিমলবাবু—সুধার পরিমলদা'। বুকের মধ্যে তখনও তার ঢিপ্ ঢিপ্ করে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। পা-পা করে এগিয়ে গেল সুধা। কখনও এ অবস্থায় পূর্ব্বে পরিমলবাবুকে দেখে নি। একটা চাপতে-না-পারা কৌতূহল জাগল ভীষণ। কোন সাড়া শব্দ করলে না। শিকারী বিড়াল যেমন করে শিকার ধরবার আগে আল্‌তো পা ফেলে ফেলে চলে, ঠিক সেইরকম নরম পদক্ষেপে এগুতে লাগলো সুধা। একেবারে পরিমলবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো। একটা আব্‌ছা ছায়া পড়লো পরিমলবাবুর দেহের ওপর। সুধার অঙ্গের ছায়া—একখানা যেন ছাই রঙের ঢাকাই মস্‌লিন—ফিন্ ফিনে পাত্‌লা। পরিমলবাবু কিছুই বুঝতে পারলে না। লক্ষ্যবিদ্ধ মন নিবিষ্ট তার বইয়ের পাতার ওপর। সুধার প্রথম দরজা খোলার শব্দও তার কানে যায় নি। সুধা দেখলে পরিমলবাবু একমনে কি একখানা বই পড়ছে। একটু দাঁড়িয়ে—আর দাঁড়ালো না। পরিমলবাবুর এই নিরঙ্কুশ তপস্যা ভঙ্গ করতে সুধার মোটেই ইচ্ছা হল' না। একটা কেমন আল্‌তো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ফিরে এল পা টিপে টিপে। এসে দাঁড়ালো সুধা খোলা দরজাটার সাম্‌নে। সেইখান থেকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো এক দৃষ্টিতে পরিমলবাবুকে নয়—দেখতে লাগলো পরিমলবাবুর নীরন্ধ্র তপস্যাকে, পরিমলবাবুর অতন্দ্র সাধনাকে। আর এই ল্যাম্পপোস্টটা

দেখছিল ঠিক ঐরকম একাগ্র দৃষ্টিতে সুধাকে নয়—সুধার শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তকে, সুধার বিস্ময়মথিত চাহনিকে—সেদিন সেই নিষুতি রাতে সেই নীরব নির্জন তৃতীয় প্রহরে।

এ অনবদ্য মধুর কাহিনী কেউ জানে না পাড়ায়—কেউ শোনে নি বোস বাড়ীতে। জানে কেবল এই ল্যাম্পপোস্টটা। সে অজ্ঞাত রহস্যের মর্ম্মসন্ধান যদি কেউ করে থাকে তো তা করেছে এই জড়বস্তুটা সেদিন সেই গভীর অন্ধকারের মাঝে চেতনার স্পন্দন নিয়ে

ঐ তো লেক্ নন্দী অর্থাৎ অনুকূল নন্দীর বাড়ী। ল্যাম্পপোস্টটা থেকে কুড়ি পঁচিশ হাত পশ্চিমদিকে রাস্তার মধ্য দিয়ে গেলে পড়ে বাঁ দিকে। বাড়ী বিক্রি করে গেছে অনুকূল নন্দীর ছেলেরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে। কিন্তু নতুন মালিকের নাম আজ পর্য্যন্ত পাড়ায় বড় একটা কেউ জানেই না। আজও জানে তারা অনুকূল নন্দীকে। চেনে তারা অনুকূল নন্দীর বাড়ী। আজও হাত দেখিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা বলে দিতে পারে ওটা অনুকূল নন্দীর বাড়ী। এ আজ অনেক দিনের কথা তখনও বনমালী শিকদারের বাড়ী হয় নি। কত বছরই বা হয়েছে—পঞ্চাশ বছরও গড়ায় নি। চোখ মেলে দেখবার মত লোকই ছিলেন পাড়ার অনুকূল নন্দী। তখন ষাট বছর বয়স হয়েছে—গায়ের রঙ্ যেন তবু ফেটে পড়ছে। কি ফর্সাই না ছিলেন অনুকূল নন্দী! মাথার মাঝখানটায় টাক পড়ে গেছে—চারিধারে অল্প অল্প কালো চুল। বেশ মানাতো। পাড়ার মধ্যে একটা পাঠশালা ছিল; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে পড়তো। রাম

পণ্ডিতের পাঠশালা। ভূগোলের বই পড়াতে পড়াতে রামপণ্ডিত ছেলেদের বুঝিয়ে দিতেন 'হ্রদ' কা'কে বলে। বলতেন—চারিধারে স্থল মাঝখানে জল থাকলেই জানবে সেটা 'হ্রদ'। দৃষ্টান্ত দিতেন—যথা, অনুকূল নন্দী মশা'য়ের মাথা। মাথার মাঝখানে টাকটা যেন জলভাগ আর চারিধারের কালো চুলগুলো হচ্ছে স্থলভাগ। ইংরাজীতে বলে Lake। বাস্—তা' শুনে ও বুঝে ছেলেরা খুব খুসী। রামপণ্ডিত বলে দিলেন আরও, হ্রদ আপনা আপনি হয়—মানুষে কেটে তৈরি করে না। মানুষের তৈরি হলে বলবে তাকে পুকুর, পুষ্করিণী বা দীঘি। দৃষ্টান্ত—যথা, নন্দী মশা'য়ের মাথার টাক আপনা আপনি হয়েছে—ওটা সেইজন্য হ্রদের উপমা। আর পাড়ার শিবু সেনের বড় ছেলেটার মাথার মাঝখানের খানিকটা নাপিত দিয়ে চেঁচে দিতে হয়েছিল পড়ে গিয়ে কেটে গেছল বলে—সেখানটাও টাকের মত দেখতে; কিন্তু সেটা হ্রদ হবে না। যেহেতু ওটা নাপিতের হাতে তৈরি, সেজন্য ওটাকে পুকুর বা পুষ্করিণীর দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। এই হচ্ছে হ্রদ ও পুষ্করিণী বা দীঘির পার্থক্য। সেদিন পাঠশালের ছুটির পর ছেলেরা হৈ-হৈ করতে করতে বাড়ী ফিরতে লাগলো আর অনুকূল নন্দী মশা'য়ের নতুন নামকরণ করলে 'লেক্ নন্দী' বলে। অনুকূল নন্দী ও লেক্ নন্দী দু'টো নামই আজও বেশ প্রচলিত আছে পাড়াতে।

অনুকূল নন্দী ও রামপণ্ডিত প্রায় সমবয়সী। নন্দী মশাই পরে শুনলেন 'লেক্ নন্দী' নামকরণের পূর্ব্ব ইতিহাসটা। শুনে মহা খুসী—হো-হো করে হেসে উঠলেন। সে কী বৃদ্ধের প্রাণখোলা হাসি! বাঁ হাত দিয়ে নিজের মাথায় টাকটার ওপর হাত বোলান আর হো-হো করে হাসতে থাকেন। আনন্দের আতিশয্যে আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। পরণের কোঁচা কাছা সামলাতে সামলাতে একরকম
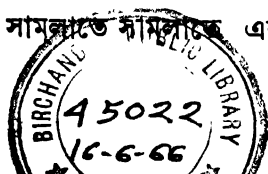
ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হলেন রামপণ্ডিতের পাঠশালায়। গিয়েই একেবারে দু'হাত বাড়িয়ে রামপণ্ডিতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে নন্দী মশাই বলতে পারেন না কিছু। তরল হাসির উচ্ছ্বাসে কেবল রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকে তাঁর কণ্ঠের বাণী। শেষে আবেগটা সামলিয়ে নিয়ে কোলাকুলির পালাটা শেষ করে নন্দী মশাই বললেন, পাণ্ডিত, বেড়ে কথা শিখিয়েছ ছেলেদের, ভাই; খাসা কথা শিখিয়ে দিয়েছ। ভূগোলের হ্রদ ও পুষ্করিণীর তফাৎ কোনদিন ছেলেরা জীবনে আর ভুলতে পারবে না। কি সুন্দর—কি সুন্দর! বুড়ো বয়সে ইচ্ছে করে তোমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়ে যাই—তোমার কাছে লেখাপড়া শিখি। কি চমৎকার উপমা—খাসা কথা—খাসা কথা!

রামপণ্ডিত আর কি করবেন—বেশ মুচকে মুচকে হাসতে থাকেন। অনুকূল নন্দী ভাগলপুরের জমিদার, তাঁর পাঠশালায় পদার্পণ করেছেন স্বেচ্ছায় ছুটে এসে—এ কি কম আনন্দের কথা! একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর নন্দী মশাইকে খাতির করে বসালেন রামপণ্ডিত। সেদিনের মত দিলেন ছেলেমেয়েদের ছুটি। তারা বই খাতা শ্লেট্ বগলে নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়ল পাঠশালা থেকে। তারপর একখানা রেকাবীতে কয়েকখানা বাতাসা ও এক গেলাস জল এনে দিলেন নন্দী মশাইকে অতিথি সম্বর্দ্ধনার জন্যে। নন্দী মশাই তা' সানন্দে গ্রহণ করে শেষে রামপণ্ডিতের থেলো হুঁকোয় তামাক সেবন করে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে এলেন।

পরের দিন রামপণ্ডিতের বাড়ী এক প্রস্ত বিরাট সিধে পাঠালেন নন্দী মশাই। এবং ব্যবস্থা করে দিলেন অতঃপর মাসিক দশ টাকা করে বৃত্তি পাবেন রামপণ্ডিত আর প্রতি দ্বাদশী ও প্রতিপদ তিথিতে নন্দী মশাইয়ের বাড়ী থেকে এক প্রস্ত করে সিধে যাবে রামপণ্ডিতের বাড়ী।

কি অমায়িক সরল লোক ছিলেন নন্দী মশাই—তা আর বলবার নয়।

প্রতি বৎসর প্রতিমা এনে অন্নপূর্ণা পূজা হ'ত নন্দী বাড়ীতে। অনুকূল নন্দী মশাই নিজে পাড়ার প্রতি বাড়ীতে গিয়ে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসতেন। ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত—কারোয় বাদ দিতেন না। এমন কি কুঞ্জ মাতালের বাপ বঙ্কু মাতালও বাদ পড়তো না। তাকেও সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আসতেন নন্দী মশাই। বঙ্কু মাতাল কেমন যেন একটু কাঁচু মঁাচু হয়ে যেত নন্দী মশা'য়ের সামনে। বলতো, আমায় আর কেন, আমায় আর কেন—পাঁচটা ভদ্রলোকের মাঝে—

আর বলতে পারতো না বঙ্কু। দু'হাত কচ্‌লাতো আর মুখে আম্‌তা আম্‌তা করতো। বাধা দিয়ে নন্দী মশাই বলতেন বঙ্কুর কাঁধে হাত দিয়ে, বঙ্কু, আমি তোমায় ডাক্‌ছি না। মায়ের পূজো, মাই-ই তোমায় ডাকছেন। ভেদাভেদ মায়ের কাছে নেই। যাবে—নিশ্চিৎ যাবে—আবার যেন আমায় তোমায় ডাকতে আসতে না হয়।

কথা শুনে বঙ্কু লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়তো তখন। একটু মুচকি হাসতো ; বলতো না আর কিছু।

পূজোর দিন—সকাল বেলা। একখানা নতুন লাল গামছা কাঁধে ফেলে পায়ে তালতলার চটি পরে লেক্ নন্দী মশাই ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াতেন এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে। এদিক ওদিক চারিদিক দেখতেন। ওদিকে নন্দী বাড়ীতে রমারম্ চলছে। ঢাক ঢোল বাজছে। পড়ে গেছে হৈ-হৈ রৈ-রৈ। সেবার হলো কি—ল্যাম্প-পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ কি দেখে যেন নন্দী মশাই কপাল কুঁচকে চমকে উঠলেন। ল্যাম্পপোস্ট ছেড়ে পা-পা করে এগুলেন। কয়েকখানা বাড়ী ছেড়ে পাশের একখানা

একতলা বাড়ীর সদরে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠলেন নন্দী মশাই, কৈ গো—মা লক্ষ্মীরা কৈ !

পাড়ার মধ্যে বেশ সম্মানী লোক নন্দী মশাই। সেই নন্দী মশাই দ্বারস্থ। এপাশ ওপাশ থেকে ছুটে এল অনেকে। নন্দী মশাই সেদিকে চাইলেন না। একেবারে 'মায়েরা কৈ, মায়েরা কৈ' বলে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলেন। তাঁর গলা পেয়ে বেরিয়ে এল বাড়ীর মালিক। নন্দী মশাইকে বসতে বলতে সাহস পাচ্ছে না। বুঝতে পেরে নন্দী মশাই বললেন, আমি এখন বসব না—আমার এখন অনেক কাজ বাকী রয়েছে বাড়ীতে। মায়েরা কোথায়—আমি দেখা করব'।

নতুন ভাড়াটে এসেছে একতলাটায়। নন্দী মশাই ভোলেন নি। যথাবিধি সেরে গেছেন নিমন্ত্রণ। পাড়ার সকলের সঙ্গে এখনও ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় নি তাদের। তবু অদূরে এসে দাঁড়ালো একটি বর্ষিয়সী বিধবা আর একটি কচি বৌ—মাথার ওপর ঘোমটা দেওয়া। তাদের দেখতে পেয়ে নন্দী মশাই বললেন, এ কি মা—আমি কি অপরাধ করলুম—বল' মা।

কেমন হক্‌চকিয়ে গেল সকলে। বুঝতে পারে না কিছু। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে নন্দী মশা'য়ের মুখের পানে চেয়ে কেবল দাঁড়িয়েই থাকে।

বললেন নন্দী মশাই বেশ হাসতে হাসতে অনেকখানি ক্ষোভ ও অভিমান কথাগুলোয় মিশিয়ে মিশিয়ে, ঐ মোড় থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলুম। আজ মায়ের পূজো আমার বাড়ীতে। পাড়ার সকলকে আমি বলে গেছি। তবু উনুনে আগুন দিলে কেন, মা? ধোঁয়া দেখে ছুটে এলুম। আজ পাড়ায় কারোর বাড়ীতে উনুন জ্বলবে না। রান্না খাওয়া আজ সকলের হবে আমার ওখানে।

প্রতি বৎসর এ দিনটায় তো এই রকম হয়ে আস্‌ছে। তা বেশ— আমি কোন কথা শুনব না। হয় উনুনে জল ঢেলে আগুন নিবোও —না হয় আমার জন্যেও দু'মুঠো চাল হাঁড়িতে নাও। এই আমি বসলুম—আর উঠ্‌ছি না।

সেইখানেই বসে পড়তে যান নন্দী মশাই। একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠল সকলে। বড় অন্যায় হয়েছে স্বীকার করলে। বুঝতে পারে নি, কোন্‌টা লৌকিকতা আর কোন্‌টা আন্তরিকতা। শেষ পর্য্যন্ত জল ঢেলে জ্বলন্ত উনুন নেবাতে হল'। যেতে হল' তক্ষুনি সকলকে সেজে-গুজে ছেলেদের মেয়েদের বৌয়েদের। নন্দী মশাই আর একবার পাড়াটা প্রদক্ষিণ করে—ল্যাম্পপোস্টটার চারিধারে কাঙালীরা জড় হয়েছে—তাদের বস্‌তে বলে বাড়ী ফিরে গেলেন।

সারাদিন ধরে আহার পর্ব্ব চল্‌ছে নন্দী বাড়ীতে। থামবে সেই রাত বারোটা একটায়। পাড়ার সকল লোককে চিনতেন লেক্ নন্দী মশাই। রাত বারোটা বেজে গেছে। নন্দী মশাই খোঁজ নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন বাড়ীর লোককে, হ্যাঁরে, বঙ্কু খেতে আসে নি এখনও? বঙ্কু—কুঞ্জর বাপ বঙ্কু—

বলতে পারে না কেউ! বিরাট ব্যাপার—কে বঙ্কু মাতালের খবর রাখে!

অবশেষে বঙ্কুর খবর বঙ্কু নিজেই রাখলে। বাইরের রোয়াকের এক অন্ধকার কোণে বঙ্কু বসেছিল। সেইখান থেকে সে নিজেই বলে উঠলো, আঁজ্ঞে হ্যাঁ—নন্দী মশাই, বঙ্কু এসেছে—বঙ্কু এসেছে।

নন্দী মশাই একটু হেসে ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, খাওয়া হয়েছে, বঙ্কু?

—আঁজ্ঞে, তার জন্যে আপনি ভাববেন না। বঙ্কুর খাওয়া হবে'খন।

তার অনেকক্ষণ পরে বঙ্কু আহারপর্ব্ব সারলে। ধীরে ধীরে মুখ মুছতে মুছতে চুপি চুপি একরকম গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ছিল বঙ্কু। নন্দী মশা'য়ের নজর এড়াতে পারে নি। তিনি ফটকের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বঙ্কুকে দেখতে পেয়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে—বঙ্কু ? খাওয়া হয়েছে তো—যাচ্ছ না কি ?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিলে বঙ্কু, আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

—শোন।

বঙ্কুকে ডেকে নিয়ে গেলেন নন্দী মশাই নীচের বৈঠকখানা ঘরে। ঘরে আর তখন কেউ ছিল না। একেবারে ভাঙা আসর। গান-বাজনা হয়ে গেছে ইতিপূর্ব্বে। তখনও সুরের আমেজে ঘরখানা যেন পূর্ণ। বঙ্কু কেমন ভয় খেয়ে গেল। নন্দী মশাই দেয়াল আলমারি চাবি দিয়ে খুলে এক বোতল বিলিতি মদ—একেবারে শিল আঁটা—বার করে এনে চুপি চুপি বঙ্কুর হাতে দিয়ে বললেন, বঙ্কু, তোমার জন্যে আনিয়ে রেখেছিলুম। যাও—বাড়ী নিয়ে যাও। রাস্তায় আর ছিপি খুলে যেন খেও না। বাড়ী গিয়ে ঘরে শোবার সময় একটু খেয়ে শুয়ে পড়'।

কী কাণ্ড! বঙ্কু মাতাল একেবারে অবাক্। কিছু বলতে পারে না 'হাঁ-না'। হাতখানা তার কাঁপছে থর্ থর্ করে।

নন্দী মশাই বললেন, কোন ভয় নেই—লজ্জা কি! আমি আজ তোমায় দিচ্ছি।

বঙ্কু ভরসা পায়। হাত বাড়িয়ে ধরে মদের বোতলটা। তারপর জামার পকেটে সেটা লুকিয়ে নিয়ে নন্দী মশাইকে একটা নমস্কার ঠুকে বেরিয়ে যায় সদর দরজা দিয়ে।

এই নন্দী মশাই—অনুকূল নন্দী—লেক্ নন্দী। ল্যাম্পপোস্ট

দেখেছে তাঁকে অনেক বার। ল্যাম্পপোস্টের কাছেই শুনেছি তাঁর কথা। নইলে আমাদের আর কি ভাগ্য—এমন মহাপুরুষের দর্শন পাব!

আশি বছর বয়সে লেক্ নন্দী দেহ রাখলেন। সারা পাড়া একেবারে যেন ডুকরে কেঁদে উঠল। একটা যেন ইন্দ্রপতন হয়ে গেল সেদিন। মৃত্যুটাও হয়েছিল ঠিক যেন ঋষির মত। একেবারে সজ্ঞানে যাকে বলে। দুপুরবেলা আহারাদি সেরে নন্দী মশাই শুয়ে শুয়ে আল্‌বোলায় তামাক টানছিলেন। কেমন যেন অন্যমনা। কাছে দাঁড়িয়ে ছিল নন্দ চাকর—অনেক দিনের সেবক।

জিজ্ঞেস করলেন, কিরে নন্দ, সকলের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাড়ীর মেয়েদের?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

তারপর আলবোলায় কয়েকটা টান দিলেন। ধোঁয়া আর বেরুল না।

নন্দ জিজ্ঞেস করলে, আর এক কল্‌কে আনবো, বাবু? ওতে আর নেই—শেষ হয়ে গেছে।

নন্দী মশাই সটকাটা মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, বলিস কি—আর নেই—শেষ হয়ে গেল! ভালো—তবে আজ সব শেষই হোক্। যা—বাড়ার ভেতর খবর দে। সকলকে ডাক্; বল্ যে—আমি চললুম।

এইটুকু মাত্র বলে তাকিয়াটা ফরাশের ওপর টেনে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়ে গেল।

তারপর সারা বাড়ীময় ছুটোছুটি—ডাকাডাকি—হাঁকাহাঁকি। এল ছুটে ছেলেরা বৌয়েরা মেয়েরা—দাস দাসী সকলে। নন্দীগৃহিণী তখন ছিলেন না। অনেক আগেই চলে গেছেন। এল তাঁর বোধ হয় অশরীরী আত্মা। ডাক্তার কবিরাজ কেউ বাদ গেল না। কিন্তু ছিল না আর করবার কিছু।

খবর পেয়ে রামপণ্ডিত ছুটে এলেন একেবারে ছোট ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালা বন্ধ করে। ছুটে এল পাড়ার যে যেখানে ছিল—এমন কি পাড়ার মেয়েরা পর্য্যন্ত।

বৃদ্ধের নাভিশ্বাস উঠ্‌ছে বেশ জোরে জোরে। কি ঘড়্‌ঘড়্‌ আওয়াজ। একটা যেন অনবদ্য ছন্দ চলছিল তার সঙ্গে। উপস্থিত সকলের চোখেই জল। কেবল নন্দী মশায়ের চোখ দুটি সমুজ্জ্বল—বিন্দুমাত্র অশ্রুও সেখানে ফুটে ওঠে নি। বেশ একটা স্নিগ্ধ শান্ত ঔদাস্যে ভরা বৃদ্ধের চোখের চাহনি।

বেলা তিনটের সময় নন্দী মশা'য়ের নাভিশ্বাস থাম্‌লো। তার অল্পক্ষণ পরেই সব স্থির হয়ে এল।

লোক জমলো অনেক। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া—ঝরা ফুলের রাশি একেবারে স্তূপীকৃত হল' শবাধারের ওপর। বার্নিশ-করা খাট এল। এল বোষ্টমের দল কীর্ত্তন গাইতে গাইতে।

রামপণ্ডিত গামছা কাঁধে এগিয়ে এলেন।

কে একজন চুপি চুপি কি যেন বললে রামপণ্ডিতের কানে কানে। রামপণ্ডিত অমনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি নন্দী মশা'য়ের মৃতদেহ ছোঁব না—নন্দী মশাই জাতিতে বামুন ছিলেন না বলে।

বলছেন কি আপনি—এঁ্যা—আমার জাত ধর্ম্ম যাবে! চুলোয় যাক্ আমার জাতধর্ম্ম—নিকুচি করেছে জাতধর্ম্মের।

তারপর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শোকের আবেগে কাঁদতে কাঁদতে রামপণ্ডিত বার্নিশ করা খাটের উপর শায়িত নন্দী মশা'য়ের মৃতদেহের পাশে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, ওরে—ওরে—নন্দী মশাই ছিলেন বামুনের বাবা—শাপভ্রষ্ট দেবতা রে—শাপভ্রষ্ট দেবতা। আমার জীবন ধর্ম্ম আজ ধন্য হল' রে তাঁর মৃতদেহ কাঁধে করে। সর'—সর'—আমি বুড়ো হলেও পারবো—পারবো নন্দী মশা'য়ের খাট কাঁধে তুলতে।

তারপর হরিধ্বনি দিলেন রামপণ্ডিত। বিপুল হরিধ্বনি। তিনিই প্রথম তুলে ধরলেন ভারি খাটখানা—সজোরে দু'হাতে ধরে। বাড়ী বাড়ী শাঁখ বেজে উঠল। ওপরের বারান্দা দিয়ে, খোলা জানালা দিয়ে মেয়েরা মুঠো মুঠো খই ছড়াতে লাগলো—ঝরা ফুলের যেন বৃষ্টি হতে লাগলো পথের দু'ধার থেকে। কত লোক! আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব উপকৃত-আদৃত লোকে সারা রাস্তাটা একেবারে ভরে গেল। এ ঠিক শ্মশানযাত্রা নয়—এ যেন নন্দী মশা'য়ের জয়যাত্রা!

সারা পাড়ায় সেদিন আর সন্ধ্যাশঙ্খ বাজে নি। গোধূলিতে নন্দী মশা'য়ের শুভযাত্রার প্রারম্ভে যা বেজেছিল, তারই সুর রণিত অনুরণিত হতে লাগলো আকাশে বাতাসে।

ল্যাম্পপোস্টটা সেদিন চেয়ে চেয়ে দেখলে সব। তারও কেমন যেন আলোতে এক পরদা ম্লানিমা ঢাকা পড়েছিল। বেশ ঔজ্জ্বল্য ছিল না সেদিন ল্যাম্পপোস্টটার আলোতে। একটা মানুষের মত মানুষ চলে গেল সেদিন। যেন ঐ মানুষই দু'হাতে আগ্‌লে ছিল পাড়ার পবিত্রতা। যত কিছু আবিলতা নিজের বিশাল বুক দিয়ে

সারা পাড়াটা থেকে দূরে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল যেন ঐ মানুষই একটা বিরাট বাঁধের মত। তাই হবে—ল্যাম্পপোস্টটা জানে তাই-ই নিশ্চিৎ। শ্রীনাথ ময়রার বৌটাকে তো খুঁজে পাওয়া গেল না তারপর; সদ্যজাত শিশুর মৃতদেহটা অমন করে রাতের অন্ধকারে তারপরেই তো—দূর ছাই, ও নোঙ্‌রা কথা থাক্।

কে কাঁদছে একলাটি দাঁড়িয়ে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঠেশ দিয়ে? এই তো সকলে চলে গেল শ্মশানের দিকে নন্দী মশা'য়ের শবাধার নিয়ে। নীরবে কে চোখ মুছে চলেছে কাপড়ের কোঁচায়? বঙ্কু—বঙ্কু মাতাল না? অশীতিপর বৃদ্ধের শোকে বঙ্কু মাতাল কাঁদছে। একটা বিরাট অন্তরের পরশ পেয়েছিল সে। লজ্জায় সাহস করে এগিয়ে যেতে পারে নি দলের সঙ্গে সঙ্গে। তাই দাঁড়িয়ে আছে একলাটি ল্যাম্পপোস্টটির পাশে। আর পারলে না থাকতে। ধীরে ধীরে নাম্‌লো এবার রাস্তাতে। চললো দলের অনেক পিছু পিছু তাদের অনুসরণ করে করে ঐ বঙ্কু—পাড়ার ঐ বঙ্কু মাতাল।

তারপর সেদিন সারা রাত ধরে তো একলাটি কেবল কেঁদেছিল রাস্তার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। নিরশ্রু ক্রন্দন তার ছড়িয়ে পড়েছিল চারিধারে। পাড়ার লেক্ নন্দীর শোকে কেঁদেছিল একজন অমন করে—কেঁদেছিল এই ল্যাম্পপোস্টটা।

আশু বদ্যির নাম শুনেছ—পাড়ার আশু বদ্যি? দেখেছ কি তাকে? দেখ' নি। আরে আমিও কি দেখেছি ছাই। শুনেছি তার কথা ল্যাম্পপোস্টের কাছে। সে যে অনেক দেখেছে শুনেছে। আহা—ঠাট্টা কর' না—কর' না বিদ্রূপ। অনেকখানি বিশেষত্ব আছে এ-দেখা-শোনার। আমরা দেখি কম, শুনি বেশি, বলি আবার আরও অনেক বেশি ঢাক পিটিয়ে আসর মাতিয়ে বাজার গরম করে। আমাদের বলায় তাই থাকে ফাঁকি—থাকে না ফাঁক। আর এই ল্যাম্পপোস্টটা দেখেছে অনেক বেশি, শুনেছে কম, বলেছে আরও কম ধীরে ধীরে নিভৃতে আমায় শুধু কাছে পেয়ে। তাই তার বলার মাঝে আছে ফাঁক—নেইক' ফাঁকি।

হ্যাঁ—আশু বদ্যি—আশু বদ্যিকে দেখেছে সে। দেখেছে তার বিধবা ভ্রাতৃবধূ শঙ্করীকে। কালো মিশ্‌মিশে চেহারা ছিল আশু বদ্যির। ছিল অনেক দিন কামরূপ কামাখ্যায়। শিখেছিল তুক্‌-তাক্‌ মন্ত্র-টন্ত্র। এখানে এসে কবিরাজী ওষুধ বেচতো আর রাত্রে মারণ, বশীকরণ, উচাটনের ক্রিয়া করত। ঐ যে—১৩ নং বাড়ীটা। ঐটা ছিল আশু বদ্যির বাড়ী। দিনের বেলায় অনেক লোক আসতো তার বাড়ীতে। রাতে আসতো মেয়েরা বেপাড়া কুপাড়া থেকে—কি সব গুজ্‌ গুজ্‌ ফুস্‌ ফুস্‌ করতো ঘরের ভেতর বসে। আবার চলে যেত সব কাজ সেরে। পয়সা উপায় করতো আশু বদ্যি মন্দ নয়। কাকের বাচ্ছা দিনের বেলায় ধরে আনতো—আর গভীর রাতে কি সব তুক্‌তাক্‌ ক'রে ছেড়ে দিত কাকের বাচ্ছাটাকে। পাড়ার সকলেই আশু বদ্যিকে ভয় করত। চেহারাখানা ছিল তার ভয় করবার মতনই। কি জানি—কার ওপর কি মন্ত্র চেলে দেবে শেষে!

একবার হলো কি—মন্ত্র পড়ে কাকের বাচ্ছা ছেড়ে দিয়েছে। ফর্‌ ফর্‌ করে উড়তে উড়তে কাকের বাচ্ছাটা গিয়ে বসলো ঐ

ল্যাম্পপোস্টটার মাথার উপর। আর কাকটা উড়তে পারে না। চোখে রাতে দেখতে পায় না মোটে। পাখা ঝট্-পট্ করে। আশু বষ্ঠির একটা লোক এসে দেখে গেল। দৌড়ে গিয়ে খবর দিলে আশু বষ্ঠিকে। আশু বষ্ঠি বেরিয়ে এল। দাঁড়ালো এসে ল্যাম্প-পোস্টটার পাশে। কাকের বাচ্ছাটার দিকে চেয়ে কি বিড়্ বিড়্ করে বললে আর অমনি ফুরুৎ করে উড়ে গেল কাকের বাচ্ছাটা। কোথায় গেল কে জানে! আশু বষ্ঠি তারপর একটু মুচকে হেসে ফিরে এল।

শোনা যায় বেপাড়ার একটা লোককে একবার বাণ মেরেছিল আশু বষ্ঠি। লোকটার নাকি মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত উঠতে লাগলো হঠাৎ। কেউ কোন কারণ খুঁজে পেলে না। করতে পারলে না কিছু ডাক্তারে। মারা গেল শেষে লোকটা।

বাজারের মেয়েমানুষ আসতো রাত্রে আশু বষ্ঠির কাছে সাদা সিল্কের চাদরে গা ঢেকে নাকে দামী নাকছাবি পরে। ল্যাম্প-পোস্টের আলো পড়তো তাতে—ঝক্‌মক্ করে উঠতো নাকছাবিটা। মোটা টাকা প্রণামী দিত আশু বষ্ঠির হাতে। কাপ্তেন বাবু বশ করবার ওষুধ নিয়ে যেত আঁচলে বেঁধে চুপি চুপি। বেশ পয়সাওলা ঘরের ছেলে—জুড়ি হাঁকিয়ে মাঠে হাওয়া খেতে যেত'। পরের বৌকে দেখতে পেয়েছে কেমন হঠাৎ খোলা জানলার ফাঁকে। বেশ টুক্‌টুকে বৌ—ফুট্‌ফুটে চেহারা—ঠোঁট দুটি পানের রসে লাল টক্‌টকে —আজকালকার 'লিপ্‌ষ্টিকে' নয়। বাবুর মন অমনি কেমন হাঁপিয়ে উঠলো। মাথা গেল ঘুরে—চোখ পড়ল ঠিক্‌রে! চাই ঐ বৌকে। দমদমার বাগান বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখবে—খাঁচার মধ্যে যেমন রাখে টিয়াপাখী। লালসায় শান পড়ছে দিন দিন। জুড়ি গাড়ী ঘুরতে থাকে সেইখানটায় বার বার। টাকা ঢালে—লোক লাগায়।

তখন পাড়ায় পাড়ায় নাপতিনীরা আসতো ; হাতে হাল্‌কা পেতলের বাটি, আল্‌তাপাতা, পা-ঘসা ঝামা ; নোক-কাটা নরুন থাকে সঙ্গে। একেবারে ঢুকে যেত অন্দরে মেয়েদের কাছে। অবারিত দ্বার ছিল তাদের। ঝামা দিয়ে বৌয়েদের পা ঘসে সন্ধ্যের আগে বুড়ো আঙুলে আল্‌তাপাতা টিপে টিপে রস বার করে লাল পালিশ দিয়ে আসতো নরম নরম পায়ে। বাবু হাত করলে নাপতিনীকে। কিছুতেই কিছু হয় না। মোসাহেব ছিল বাবুর। সেই নাম করলে আশু বদ্যির। জুড়ি হাঁকিয়ে বাবু এলেন আশু বদ্যির বাড়ীতে রাতের আঁধার বেশ জমাট বাঁধলে। তারপর চলে গুজ্‌-গুজ্‌ ফুস্‌-ফুস্‌। বড় খদ্দের আশু বদ্যির। হাত-ছাড়া করলে না। উঠে পড়ে লেগে গেল বাবুর দমদমার বাগান বাড়ীর বাহার বাড়াতে।

একবার নিশি ডেকেছিল পাড়ায়। ঘটকদের বাড়ীর বড় ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যায় নি দু'দিন। রাত দুপুর থেকে উধাও হয়েছিল। পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরেছিল। শেষে পাওয়া গেল—শালকের বাঁধা ঘাটে। উস্‌কো খুস্‌কো চুল—চোখের কোল গেছে বসে—যেন নেশা করে বুঁদ্‌ হয়ে বসেছিল সেখানে। ধরে নিয়ে এল বাড়ীতে। খবরটা রটে গেল পাড়ায়। শিউরে উঠল সকলে। এ নিশি ডাকালে কে ? লোকে বলতো—এসব আশু বদ্যির কাজ আর কারোর নয় ; দেখ' কার কি সর্ব্বনাশ করে। সর্ব্বনাশই হতে চলেছিল আর একটু হ'লে। শ্যাম লাহার মেজ মেয়ে—বয়স হয়েছে বেশ—বিয়ে হয় নি তখনও। লাহা বাড়ী একেবারে নিষুতি

পুরী। নিশি ডাকলো সেই রাতে। ডাকলো শ্যাম লাহার মেজমেয়ের নাম ধরে—ডাক নাম ধরে—গোলাপী-গোলাপী। গোলাপী তড়াক্ ক'রে অমনি ডাক শুনে বিছানা থেকে উঠে পড়লো। নিঃশব্দে দরজা খুলে তর্ তর্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল গোলাপী। একেবারে বেরিয়ে এল বাইরে রাস্তার মাঝে একমাথা কালো চুল এলিয়ে। হন্ হন্ ক'রে চলতে লাগলো সোজা। ঐ ল্যাম্পপোস্টটার কাছে এসে দাঁড়ালো। কেমন ঘোর লেগেছে মনে। ঘুরপাক খেতে লাগলো ওরির চারধারে। অমনি ১৩নং বাড়ীর দরজা গেল খুলে। আশু বন্থি এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। অন্ধকারে মিশে গেছে গায়ের রঙ্। দেখা যায় না—দেখলেও চেনা যায় না কিছু। আশু বন্থি এগিয়ে আসছিল ল্যাম্পপোস্টটার দিকে। গোলাপী দাঁড়িয়ে আছে ওখানে কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে। গায়ের আঁচল তার লুটোচ্ছে পথের ওপর। আলো জ্বলছে ল্যাম্পপোস্টটার মাথায় দপ্ দপ্ ক'রে। বুকের ভেতরটা তার আথালি-পাথালি করছিল মেয়েটাকে ঝাপটে ধরে রক্ষে করতে। গুরুবল—রামপণ্ডিত ফিরছিলেন সেই সময় আত্মীয়বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সেরে। দেখতে পেলেন মেয়েটাকে। জিজ্ঞেস করলেন ভারি গলায়, কে ? উত্তর পেলেন না কিছু। মুখ ঘোরাতেই একেবারে আশু বন্থির সঙ্গে চোখোচোখি।

আশু বন্থি অমনি হন্তদন্ত হয়ে বলে উঠলো, ধরুন পণ্ডিতমশাই—ধরুন—ধরুন। নিশিতে ডেকেছে—নিশিতে ডেকেছে। আমি পিছু পিছু ছুটে আসছিলুম ধরতে। ধরুন—ধরুন।

রামপণ্ডিত শুনেছিলেন নিশি-ডাকের কথা। দৌড়ে কাছে গিয়ে রামপণ্ডিত খপ্ করে গোলাপীর হাতখানা ধরে ফেললেন।

—কাদের মেয়ে—কাদের মেয়ে !

গোলাপী অমনি নেতিয়ে পড়লো সেখানে। একেবারে মূর্চ্ছা গেল ল্যাম্পপোস্টটার তলায়।

তারপর রামপণ্ডিতের গলায় জেগে উঠলো সারা পাড়া। হৈ-হৈ পড়ে গেল রাত্রে। নিশিতে ডেকেছিল শ্যাম লাহার মেয়ে গোলাপীকে। ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো সকলের দেহে। যাক্— মেয়েটা বেঁচে গেছে খুব—বেঁচে গেছে খুব। ধরাধরি ক'রে গোলাপীকে বাড়ী নিয়ে আসা হ'লো। জল ছিটোতে লাগলো গোলাপীর মুখে।

ব্যাস্—তারপর থেকে রাত হ'লেই বাড়তে লাগলো ভয়—কি হয়—কি হয়! ছেলে মেয়েদের পায়ে কাপড় বেঁধে সেই কাপড়ের খুঁট হাতের মুঠোয় চেপে ধরে শুতে লাগলো পাশে তাদের মায়েরা। ঘর ঘর পূজো পাঠাতে লাগলো মা কালীর মন্দিরে। এ-নিশি তাড়াও, মা—তাড়াও। পাড়ায় শান্তি দাও, মা—শান্তি দাও।

পরদিন সকালে রামপণ্ডিত বললেন, আজ থেকে রাতে পাড়ায় পাহারা দোব আমি। . দেখি নিশি কখন ডেকে যায়।

একটা বড় বাঁশের লাঠি নিয়ে সত্যিই রামপণ্ডিত পাহারা দিতে লাগলেন তারপর থেকেই। কিন্তু ভয় যায় না কারো'। সকলেই ভাবে—রামপণ্ডিতের ঘাড়টা মটকে নিশি ঠিক একদিন রাতে তাকে মেরে ফেলবে। নিশির হাতেই বুড়োর মৃত্যু আছে লেখা। রাম পণ্ডিত কারোর কথা গ্রাহ্য করেন না। বাঁশের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এই ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসে দাঁড়ান খানিকক্ষণ। আবার ফিরে চলেন ওদিকে। আলো জ্বলে ল্যাম্পপোস্টের মাথায়। পেঁচা ডাকে বাড়ীর ছাদে। বাদুড় উড়ে যায় ওপর দিয়ে। নিশির দেখা নেই। তিন দিন সব চুপ্-চাপ—থম্-থমে ভাব।

অসুখে পড়লেন রাম পণ্ডিত। আর পারলেন না পাহারা

দিতে। সকলে বলে উঠলো, ঐ হয়েছে—রামপণ্ডিত গেল এবার—নিশিতে আঁচড়ে দিয়েছে রামপণ্ডিতকে। ভয় গেল বেড়ে। আবার কি হয়—কি হয়! বাড়ী বাড়ী সদরে পড়লো তালা। চাবি রইলো কর্ত্তাদের ট্যাঁকে। এখন নিশি যদি ডেকে বসে বাড়ার ঐ কর্ত্তাদের—তখন?

কুঞ্জ মাতাল শুনেছিল সব। ফিরছিল সেদিন নেশা ক'রে কেমন একটু টলতে টলতে। কি খেয়ালে বলে উঠলো, কৈ বাবা—নিশি বাপ আমার, দেখা দাও—দেখা দাও।

যাক্—নিশিপর্ব্ব আর বেশি দিন রইলো না পাড়ায়। একেবারে যেন দূর হয়ে গেল গঙ্গার জলে ডুবে মরতে। নিশি তাড়ালে শেষ পর্য্যন্ত শঙ্করী—ঐ আশু বখ্যির বিধবা ভ্রাতৃবধূ শঙ্করী। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। জানে সব ঐ ল্যাম্পপোস্টটা।

আশু বখ্যিরা দু'ভাই ছিল। ছোট ভা'য়ের বৌ শঙ্করী। ছেলে মেয়ে হয় নি শঙ্করীর। আশু বখ্যি চেয়েছিল শঙ্করী বাড়ী ছেড়ে চলে যাক্ তার বাপের বাড়ী আগরপাড়ায়। কিন্তু শঙ্করী তা চায় নি। সে গ্যাঁট হয়ে ঐ ১৩নং বাড়ীতে বাস করতো। দু' ভায়ের হাঁড়ি পৃথক ছিল বহুদিন। স্বামী মরে যেতেও শঙ্করী হাঁড়ির পার্থক্য ঘোচালে না—বজায় রাখলে। শঙ্করীর মেজাজ ছিল উগ্র। গ্রাহ্য করতো না আশু বখ্যিকে। সমানে গলা হাঁকিয়ে ঝগড়া করতো। শাসন করতে ঘর থেকে বেরিয়ে তেড়ে যেত আশু বখ্যি। ওদিক থেকে তেড়ে আসতো শঙ্করীও। আর আশু বখ্যির সাহসে কুলোত না—পিছিয়ে আসতো গজ্ গজ্ করতে করতে। তখন বেরিয়ে আসতো তার বৌ, টেনে চলতো ঝগড়ার সুর—যাত্রাগানের তান-বাটের একটা চরম ধস্তাধস্তি করে যেন ক্ষান্ত হ'তো পরে।

রাগের মাথায় আশু বক্সি বলতো শঙ্করীকে, তন্ত্রে মন্ত্রে তোকে বাড়ী থেকে তাড়াবো, তবে ছাড়বো।

উত্তর দিতো শঙ্করী হাতের ঝাঁটা সপাঙ্ সপাঙ্ ক'রে ঘরের মেঝের ওপর আছড়াতে আছড়াতে, এই ঝাঁটা মেরে তোর তন্তর মন্তর তাড়াবো—তবে ছাড়বো। নিকুচি করেছে তোর তন্তর মন্তর। বাড়ীর অর্দ্ধেক ভাগ আমার—আমায় তাড়ায় কে ?

—আইনে বিধবা বাঁজা মেয়েছেলে সম্পত্তির অংশ পায় না।

আশু বক্সি ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলতো।

—আইনে না পাক্, হাতের খ্যাংরার জোরে পাবে।

উত্তর দিয়ে যেত সমানে শঙ্করী। যা' মুখে আসতো বলতো। দাপট ছিল খুব। আশু বক্সির সাহস যেত কুঁচকে।

শঙ্করী আপনি রাঁধে বাড়ে খায়। দুপুর বেলা একগাল পান মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে হাতে দোক্তা-পানের কৌটো নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরুতো শঙ্করী নিজের ঘরখানিতে তালা চাবি দিয়ে। আবার ফিরতো সন্ধ্যের আগে।

পাড়ায় রটিয়ে দিলে আশু বক্সি, শঙ্করী নষ্টা মেয়ে। শঙ্করী ছাড়বার পাত্রী নয়। সেও পাড়ায় বলে' বলে' বেড়াতে লাগলো, ভাশুরের স্বভাব চরিত্তির খারাপ; বিধবা ভাদ্দর বৌয়ের ধর্ম্ম নষ্ট করতে চায়। শঙ্করী রাজী হয় নি তাতে—তাইতে এই সব নোঙ্রা রটনা। পাড়ার পাঁচজনকে বলে, বাড়ী ভাগ করে দাও। শঙ্করী তার অংশ বেচে কাশী চলে যাবে।

এমনি চলতে চলতে একদিন ঘটলো এক ঘটনা। আশু বক্সির বাড়িতে বেঁধে গেল তুমুল কাণ্ড। ভাশুর ভাদ্দর বৌয়ে সে কী ঝগড়া! মুখের লড়াই থামলো তো—শেষে আরম্ভ হলো ঘটি বাটি ছোঁড়াছুঁড়ি। শঙ্করী একলা একদিকে, ওদিকে সস্ত্রীক আশু বক্সি

ছেলে মেয়ে সমেত। হার মানে না কেউ। তেড়ে এল আশু বণ্ডি শঙ্করীকে গলা ধরে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে। শঙ্করীর কি বুদ্ধি খেললো মাথায়! বল্‌লে মুখে রাগের মাথায় কাঁপতে কাঁপতে, দাঁড়া—আজ সগুষ্টি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অবলা মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে আসিস্—এত বড় বুকের পাটা তোর!

এই না বলতে বলতে—কোথায় ছিল আঁশবঁটি—সেই আঁশবঁটি মেঝের ওপর পেড়ে, বসলো তাতে উবু হয়ে শঙ্করী ঠিক মাছ কুটতে যেমন ক'রে বসে বাজারের মেছুনীরা। ফস্ ক'রে নিজের বাঁ হাতখানা ডান হাত দিয়ে ধরে চকিতে বসিয়ে দিলে বঁটির ফলাখানার ওপর। তার পর কাঁচারক্ত-ঝরা বাঁ হাতখানা ধরে একেবারে উন্মাদিনীর মত আলু-থালু কেশ-বেশে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তা দিয়ে ছুটে চললো থানার দিকে। মুখে কেবল বুলি, খুন করলে—খুন করলে।

টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছিল রাস্তায়। রক্তমাখা ডান হাতখানা দিয়ে টাল সাম্‌লাতে শঙ্করী একবার ধরে ফেলেছিল ঐ ল্যাম্প-পোস্টটা। একেবারে পুরো পাঁচ আঙুলের লাল ছাপ পড়ে গেছলো ল্যাম্পপোস্টটার গায়ে। সে-ছাপ পাড়ার লোকেরা দেখতো গিয়ে গিয়ে। তার দু'দিন পরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল খুব। তাইতে ধুয়ে মুছে গেল সে দাগ—নইলে—

তারপর হুলুস্থূল কাণ্ড। এল' পুলিশ—এল' ইন্‌স্পেক্টর। নিয়ে গেল আশু বণ্ডিকে ধরে থানায়। আঁশবঁটিখানা নিয়ে চললো একজন জমাদার। বঁটির ফলায় শঙ্করীর হাতের রক্ত তখন জমাট বেঁধে গেছে। ডায়েরীতে লেখা হলো সব। আশু বণ্ডিকে ফাটকে পুরলে। পাঠালে শঙ্করীকে হাসপাতালে পুলিশের অধীনে।

বিচার হলো। বিচারে বেশ মোটা রকমের জরিমানা হলো

আশু বখ্শির। ছাড়ান পেলে শঙ্করী। আর এ পাড়ায় রইলো না তারা। আশু বখ্শি বাড়ী দিলে বেচে—১৩নং বাড়ী। বুঝে নিলে শঙ্করী তার নিজের হিস্সা। ঠাণ্ডা করে দিলে ভাদ্দরবৌ ভাশুরকে। তারপর থেকে পাড়ায় নিশির ডাক গেল একেবারে থেমে।

এ কি আজকের কথা! এ সব কাহিনী এখানে জানে ক'জন? জানে কেবল ঐ ল্যাম্পপোস্টটা।

বাড়ী বিক্রির টাকা নিয়ে আশু ব টালিগঞ্জে বাড়ি কিনলে। নিজের ব্যবসা ফেঁদে বসলো সেখানে। তেমনি করে রাতের বেলায় মন্ত্র পড়ে' ছাড়তে লাগলো কালো কাকের বাচ্ছা। কাপ্তেন বাবুরা যেতো; যেতো বাজারের মেয়েমানুষরা। আশু বখ্শির হাতে টাকা দিয়ে লুকিয়ে আনতো বশীকরণ মাদুলি, আনতো তুক্তাকের ওষুধ—আরও আনতো কত কি!

পাঁচ বছর পরে একখানা ভাড়াটে ফিটন্ গাড়ী এসে দাঁড়ালো ঐ ল্যাম্পপোস্টটার পাশে। নামলো তা' থেকে ঘাগ্রাপরা এক বয়স্থা মেয়েছেলে। গাড়ীর মধ্যে সিঙ্গার কোম্পানীর হাত-সেলাই কল গোটা চারেক। মেয়েছেলে ক্যান্ভাসার। হাত-সেলাই কল বাড়ির মেয়েদের দেখিয়ে বেচতে এসেছে বাড়ি বাড়ি। তখন এইরকম ভাবেই আসতো তারা। মেয়েছেলেটির পায়ে হিলওলা জুতো, চোখে চশমা, হাতে একটা চ্যাপ্টা চক্লেট রঙের ছোট ব্যাগ। এই ল্যাম্পপোস্টটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়ালো। ও মাগো—ওকি! বাঁ হাতের মাঝখানে মস্ত বড় একটা কাটা দাগ! ক্ষতটা শুকিয়ে গেছে—দাগটা যায় নি আজও। হুঁ—আর যায় কোথা! ল্যাম্পপোস্টটা চিনতে পেরেছিল, এ যে সেই শঙ্করী—আশু বখ্শির সেই বিধবা ভ্রাতৃবধূ শঙ্করী। খ্রীস্টান্ হয়েছে। রবিবার রবিবার গির্জ্জেয় যায়, বাইবেল পড়ে, যিশুর উপাসনা করে হাঁটু

গেড়ে বসে। বিয়ে করেছে এক আধবুড়ো য়্যাংলোইণ্ডিয়্যানকে। থাকে এন্টালিতে য়্যাণ্টনি সাহেবের গলিতে। নতুন নাম হয়েছে শঙ্করীর—মিসেস্ শান্‌শশী এণ্ড্রুজ্।

মিসেস্ এণ্ড্রুজ্ জুতো পরে গট্ গট্ ক'রে পা ফেলে এ পাড়ার বাড়ি বাড়ি ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেল। শঙ্করীর মিছরি-দিদি থাক্‌তো ঐ ১৭নং বাড়িতে। শঙ্করীর মতনই অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল সে। দেওরের সংসারে শঙ্করীর মিছরিদিদি ছিল বড় বৌ—বাড়ির গিন্নী। হাঁসেরপুরি সংসারখানা রেখেছিল একেবারে মাথায় ক'রে। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। দেখা হ'লো দুজনের এতদিন পরে। অনেক কথা সুখ-দুঃখের প্রাণের-মনের হ'লো। শেষে মিসেস্ এণ্ড্রুজ্ হাত-সেলাই কল একটা গছিয়ে এল সেইখানে। তার পাশের বাড়ির বৌ রাখলে আর একটা। দুটো কল সেদিন মিসেস্ এণ্ড্রুজ্ বেচে গেল এই পাড়ায় খ্রীস্টান্ হয়ে প্রথম এসেই। আর ছেড়ে গেল আশু বস্থির খবর—যেমন করে ছেড়ে দেয় জলের মধ্যে জাওলা মাছ। সে-খবর আজও আছে বেঁচে। ক'দিনেই সে-খবর ছড়িয়ে পড়লো বাড়ি বাড়ি। শুনে সকলে আঁত্‌কে বলে উঠলো, এ্যা—তাই নাকি!

ল্যাম্পপোস্টটাও শুনলে সে কথা। রামপণ্ডিতকে বলছিলো শ্যাম লাহা—গোলাপীর বাবা—নিশিতে একরাতে ডেকেছিল যে গোলাপীকে, সেই গোলাপীর বাবা। এই ল্যাম্পপোস্টটার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলছিলো শ্যাম লাহা। খবরটা তোমরাও শুনে রাখো। টালিগঞ্জে বাড়ি কিনলে আশু বস্থি। কিন্তু ভোগ করতে পারলে না বেশিদিন। তখন টালিগঞ্জের দক্ষিণ দিকটায় ছিল ভীষণ জঙ্গল। দিন দুপুরে আশু বস্থি যায় সেখানে—কি করতে কে জানে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি। মেঘে ঠাসা আকাশ। গুড়্ গুড়্

করে মেঘ ডাকছে—যেন কামান দাগছে আকাশে। চক্মকিয়ে উঠছে ঘন ঘন বিদ্যুৎরেখা। চিড়্ খাচ্ছে চারিদিকে; ছুটছে যেন অগ্নিবাণ একেবারে লক্ লক্ ক'রে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ওপর পানে তাকাবে কে! সাহস আছে কার! গম্ভীর আকাশে বর্ষণ হচ্ছে খুব। সে-বছর সে রকম জল আর একদিনও হয় নি। আব্হাওয়ার অফিসে সে-কথা লেখা আছে—দেখতে পাবে গেলে। কী দুর্য্যোগ—কী দুর্য্যোগ—প্রকৃতি যেন রণমুখী! ভিজে গামছা মাথায় জড়িয়ে আশু বষ্টি বেরুলো পথে অমন দিনে। ঘুরে ঘুরে গাছের শিকড় খুঁজছিল। আর ঠিক এমন সময় আশু বষ্টির মাথায় কড়্ কড়্ কড়াৎ করে পড়লো বাজ—ওপর থেকে যেন নেমে এল রুদ্রের জ্বলন্ত অভিশাপ। তাকে আর ঠেকাতে পারলে না কিছুতে। ঠেকাবার অবসর মিললো না আশু বষ্টির। তার সব কিছু হলো শেষ। পোড়া কাঠকয়লার মত দেহখানার রঙ্ হ'লো চকিতে। তারপর আশু বষ্টি রইলো পড়ে সেইখানে। সবিশেষ জানা গেল বৃষ্টি থামলে অপরাহ্ণে।

এই আশু বষ্টির ইতিকথা। ছেলে মেয়ে নিয়ে আশু বষ্টির বৌ পথে বসলো। সঞ্চয় কিছু নেই—খাবে কি! খবর পেয়ে ছুটে গেল মিসেস্ শানশশী এণ্ড্রুজ আশু বষ্টির টালিগঞ্জের বাড়ীতে। বাজার থেকে খাবার কিনে এনে আশু বষ্টির ছেলে মেয়েদের হাতে তুলে দিলে। পরের দিন আশু বষ্টির বড় ছেলেকে ডেকে এনে সিঙ্গার কোম্পানিতে চাকরী ক'রে দিলে ত্রিশ টাকা মাসমাইনের মিষ্টার এণ্ড্রুজকে বলে' মিষ্টার এণ্ড্রুজ ছিল সিঙ্গার কোম্পানীর সেলস্ম্যান্।

কে আসছে ? সুধা না ? নগেন বসুর মেয়ে সুধাই তো ! আরে বাবা—এ যে চেনা যায় না আর ! পাড়ার লোক থ' মেরে গেছে একেবারে। মেয়েদের চোখ উঠেছে কপালে। ল্যাম্পপোস্টটা চিনতে পেরেছিল সেদিন সুধাকে। পরিষ্কার শাড়ির ওপর কালো রঙের গাউন্ চাপিয়ে—মাথায় চৌকোনা ক্যাপ্ পরে'—সুধা ফিরছিল কন্‌ভোকেসন্ (Convocation) থেকে। বি-এ পাশ করেছে সে। ডিপ্লোমা আনতে গেছলো অমন সেজে গুজে। কি সুন্দরই না সেদিন মানিয়েছিল তাকে ! বাড়ী এসেই সুধা প্রথম তার মাকে প্রণাম করলে। অত বড় ডাগর মেয়ে—অমন সাজসজ্জা—মা আর আশীর্ব্বাদ করবে কি—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে কেবল চেয়ে রইল সুধার মুখের পানে। আনন্দে ও গর্ব্বে সুধার মায়ের ছ'চোখ কেমন ছলছলিয়ে উঠেছিল। সুধা আর দাঁড়ালো না কাছে। ওপর থেকে সেই বেশেই নেমে এল নীচে। বি-এ পাশের ডিপ্লোমাখানা হাতের কবলে। সরাসরি ঢুকে গেল পরিমলবাবুর ঘরে। তরুবালা ঘরে ছিল না। ছেলে মেয়েরাও নেই। কোথায় যেন গেছে তারা। পরিমলবাবু শুয়েছিল একটু বিছানার ওপর। সুধাকে দেখতে পেয়ে ধড়্মড়্ করে উঠে বসল'। হাসি হাসি মুখ—জিজ্ঞেস করলে, কি খবর—সুধা যে !

সুধা বললে, দাদা, পা ছ'খানা একটু এগিয়ে দিন। প্রণাম করব' একবার। আজ কন্‌ভোকেশনে গেছলুম—বি-এ পাশের ডিপ্লোমা নিয়ে এলুম এই।

পরিমলবাবু বললে, বেশ—বেশ। খুব আনন্দের কথা। তা' এতে আমার পায়ে প্রণাম ক'রে মাথা ঠোকবার কি আছে!

জবাব দিলে সুধা। বললে, আছে অনেক। আপনি আমায় পড়া বুঝিয়ে দিয়ে সাহায্য না করলে মাঝে মাঝে, আমি কিছুতেই পাশ করতে পারতুম না।

—ওটা তোমার বিনয়ের অহঙ্কার, সুধা।

—তা হোক্।

ছাড়লে না সুধা। জোর ক'রে পরিমলবাবুর হু'পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে প্রণামটা সারলে খুব শ্রদ্ধা ভক্তিতে নুয়ে পড়ে।

ডিপ্লোমাটা সুধার হাত থেকে পরিমলবাবু নিলে একবার। সবটা খুলে পড়ে আবার গুটিয়ে সুধার হাতে ফেরত দিলে। বললে, বস'—সুধা। এবার কি করবে ঠিক করলে? এম-এ'টা দেবে না?

সুধার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু উপায় ছিল না আর।

—আর এম-এ পড়া আমার হবে না, পরিমলদা'। একটা ভালো চাকরি এবার আমায় দেখে নিতেই হবে। নইলে চালাতে পারবো না কিছুতে। মার অসুখে মাস মাস অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে—জানেন তো!

পরিমলবাবু বললে, তা বটে।

ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে সুধা, বৌদি কোথা—ছেলে মেয়েরা কৈ—তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না।

পরিমলবাবু বললে, তোমার বৌদি ছেলে মেয়ে নিয়ে সকালে তার বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছে শ্যামবাজারে। আস্‌বে সন্ধ্যের পর।

জিজ্ঞেস করলে সুধা, আপনি তাহ'লে সারাদিন আজ কিছু খান নি? রান্না কে করলে?

অনেকখানি আন্তরিকতা উছ্‌লে উঠেছিল সুধার প্রশ্নে।

বললে পরিমলবাবু, অনাহারে থাকি নি। চিঁড়ে ভিজিয়ে রেখেছিলুম, তাই দই দিয়ে মেখে খেয়েছি।

—কেন—আমায় একবার বল্‌লেই তো হ'তো। আমি ওপর থেকে খাবার করে নিয়ে আসতুম। আচ্ছা—বসুন আপনি একটু, আমি খাবার তৈরি করে নিয়ে আস্‌ছি ষ্টোভ্‌ জ্বেলে।

—না—না—এখন কিছু দরকার হবে না আমার। প্রয়োজন হ'লে আমি ওপরে গিয়ে তোমাকেই বলব'খন—তাতে আর আমার লজ্জা কি! তুমি বস'।

সুধা কিন্তু বসলো না। দাঁড়িয়েই রইলো।

ঠিক সেই সময় তরুবালা ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। ফিরলো বেড়িয়ে বোনের বাড়ি। সুধাকে ও পরিমল বাবুকে ঐ অবস্থায় দেখে একেবারে যেন চমকে উঠলো তরুবালা। সুধার বেশভূষা দেখে আরও যেন কেমনতর হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না কিছু। বুঝিয়ে দিলে সুধা নিজে। বললে, বৌদি, বি-এ পাশের সার্টিফিকেট্‌ নিয়ে এলুম আজ।

তরুবালা শুধু বললে মুখে, বেশ—বেশ। তোমরা, বাপু, লেখা-পড়া-জানা স্বাধীন মেয়ে—যা' করবে, তাই সাজবে। আমরা আর কি বলবো বলো।

সুধা বললে, না বৌদি, আমাদের আর বলবার কিছু নেই তোমাদের। আমরা একেবারে বলার বাইরে চলে গেছি। এখন তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন দাও। সারাদিন দাদার ভাত খাওয়া হয় নি।

একটু মুচকি হেসে কথার পিঠে ঠেশ দিয়ে বলে উঠলো তরুবালা,

তা সারাদিন ছুটো রেঁধে দাও নি কেন তোমার দাদাকে—আমি তো বারণ ক'রে যাই নি।

সুধা বললে, জানতেই পারি নি—তুমি চলে গেছ সকালে তোমার বোনের বাড়ি। জানতে পারলে—নিশ্চয়ই রেঁধে দিতুম। তোমার বারণ নিষেধ মানছে কে, বৌদি!

তরুবালা কেমন সিঁটকে গেল—আর বল্‌লে না কিছু।

সুধা সেদিন একটু মৃদু হেসে পরিমলবাবুর দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

সাহস আছে সুধার। একবার কি হয়েছিল জানো? বল্‌লে সেদিন ল্যাম্পপোস্টটা।

একদিন হ'লো কি—বেলা তখন তিনটে। সাম্‌নের মাসে বি-এ পরীক্ষা দেবে সুধা। পড়ছিল আপন মনে ঘরে বসে। পরিমলবাবু আছেন স্কুলে—ছেলে পড়াচ্ছেন সেখানে। তখন কলকাতায় খুব সিনেমার চলন। নতুন নতুন বাঙ্‌লা ছবি আসছে প্রায়ই। তরুবালার বাদ যায় না কোনোটা; প্রত্যেকটাই দেখা চাই। কোনো ছবি না দেখতে পেলে, কেমন মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে যতদিন না সে ছবি দেখতে পায়। গেছে তরুবালা সিনেমা দেখতে। পাড়ার একটা ছেলেকে দিয়ে টিকিট কিনে আনায় আগে। ঘরে রেখে গেছে সাত বছরের এক মেয়েকে চার বছরের এক ছোট ছেলেকে আগ্‌লাবার জন্যে। অমন প্রায়ই যায়। সেদিন হয়েছে কি—মেয়েটা আর একটা সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে ঘরে বসে এক মনে কড়ি খেলছে। বোস বাড়ীতে অনেক ভাড়াটে—ছোট ছোট ছেলে মেয়ের অভাব নেই। ছেলে মানুষের মন—সব ভুলে মেতে উঠেছে খেলায়। ওদিকে ছোট ছেলেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কখন—লক্ষ্য রাখতে পারে নি মেয়েটা। গুটি গুটি সিঁড়ি বেয়ে ওপরের রাস্তার ধারের

বারান্দায় উঠে গিয়ে রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে আপন মনে খেলা করছে সরু সরু নড়্‌নড়ে মরচে-পড়া লোহার সিক্ ধরে টানাটানি ক'রে। ফস্ ক'রে খুলে গেছে রেলিঙের সিক্—আর অমনি ছোট ছেলেটা গেল ঝপ্ করে পড়ে একেবারে বাইরে রাস্তার ওপর। পড়েই অজ্ঞান—মাথাটা গেল একেবারে থেঁৎলে—রক্তারক্তি ব্যাপার! আওয়াজ শুনেই দৌড়ে বেরিয়ে এল সুধা। তারপর ওপর থেকে উঁকি মেরে দেখে 'ও মাগো' ব'লে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল নীচেয়। কারোয় কিছু বল্‌লে না বাড়িতে। ধমকালে না তখনও কড়ি খেলায় রত মেয়েটাকে। লোক জড় হয়ে গেছে তখন রাস্তায়। সুধা ছুটে গিয়ে বুকে তুলে নিলে অজ্ঞান ছেলেটাকে। চোখে মুখে জল দিলে। তারপর পাড়ার একটা ছেলেকে স্কুলে ছুটে গিয়ে পরিমল বাবুকে খবর দিতে পাঠিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলো তাতে। রওনা হ'লো হাসপাতালের দিকে। সেই ট্যাক্সিখানা এসে দাঁড়িয়েছিল এই ল্যাম্পপোস্টটার পাশেই। ও দেখেছে সব সেদিনের কাণ্ড।

পরিমলবাবু ছুটে গেল খবর পেয়ে হাসপাতালে। যথাসময়ে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরলো তরুবালা। সব শুনে বড় মেয়েটাকে এমন মার মারলে যে, তার গায়ে ব্যথা ছিল পাঁচদিন। তা' থাকুক। ছোট ছেলেটা কিন্তু বেঁচে ফিরলো হাসপাতাল থেকে তিনদিন পরে।

সুধার এই কার্য্যকলাপে টিট্‌কিরি দিলে পাড়ার অনেকে। মেয়েছেলের একি ধিঙ্গিপনা, বাপু! ছি-ছি—একেবারে লাফিয়ে চলে পুরুষের ঘাড়ের ওপর দিয়ে—আরে রামচন্দ্র—রামচন্দ্র!

সব শুনেছে এই ল্যাম্পপোস্টটা। পথের মোড়ে একলা দাঁড়িয়ে কত না আপন মনে ফিক্ ফিক্ ক'রে হেসে উঠেছিল তারপর ক'দিন ধরে সাদা আলো ছড়াবার মাঝে মাঝে। দেখেছে—কড়ি খেলে না

আর পরিমলবাবুর বড় মেয়েটা। তরুবালা তবু সিনেমা দেখতে যায় আবার। বলে না কিছু পরিমলবাবু। ভাঙা রেলিং মিস্ত্রী ডাকিয়ে নতুন ক'রে মেরামত করিয়ে রাখলে সুধা।

সেদিন রাত দশটার সময় ল্যাম্পপোস্টটার পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিলুম। হঠাৎ মনে হ'লো ল্যাম্পপোস্টটা যেন হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। কেমন হক্‌চকিয়ে গেলুম। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই ল্যাম্পপোস্টের হাসি গেল থেমে। পরে শুনতে পেলুম সেই বাগ-বাজারের তিলিদের বাড়ীর বৌয়ের কাণ্ডকারখানা। ঘটেছিল ঠিক এই রাত দশটার সময় এইখানটায়।

সেবার শীত পড়েছে বেশ। যে যার ঘরে ঢুকে বসে আছে। নির্বিকারে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাম্পপোস্টটা। শীত-গ্রীষ্ম সমান বোধ হয়ে গেছে তার। কি কঠোর তপস্যা ক'রে গেল এক মনে! কুয়াসা খুব—ল্যাম্পপোস্টের আলোর আভা চেপে ধরেছে একেবারে চারিদিক থেকে। এমন সময় একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ্ ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী তীরবেগে ছুটে আসছিল দক্ষিণদিক থেকে। কি ঘড়্ ঘড়্ তার আওয়াজ—সে আওয়াজ ভেদ ক'রে একটি মেয়েকণ্ঠের কান্না মাথা উঁচিয়ে আসছে বরাবর। গাড়ীর দু'দিকের শার্সি খড়্‌খড়ি তোলা—একেবারে কৌটোর মত বন্ধ চারিদিকে। মেয়েটি কাঁদছে গাড়ীর ভেতর—কচি বৌয়ের গলা। কোথা থেকে আসছে কে জানে! মাঝে মাঝে মেয়েটা চুপ ক'রে থাকে। আবার খানিকক্ষণ পরে কেমন কেঁদে কেঁদে ওঠে। ব্যাপারটা লক্ষ্যে পড়ে নি কারো'।

রামপণ্ডিতের বয়স তখন কতই বা হবে—এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ। নিত্য গঙ্গাস্নান করেন রামপণ্ডিত। শরীরে তাঁর ব্যাধি তেমন ক'রে কায়েমী বাসা বাঁধতেই পারে নি কোনদিন। রামপণ্ডিত কেমন ঘর থেকেই শুনতে পেয়েছিলেন মেয়েটির কান্না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন বাইরে। পথে চোখ পড়তেই দেখতে পান—একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী ছুটে গেল তাঁর সুমুখ দিয়ে। আর অমনি শুনতে পেলেন গাড়ীর ভেতর থেকে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ। কি ব্যাপার—বুঝতে পারেন না কিছু।

মেয়েটি চেঁচাচ্ছে, ওগো কে কোথায় আছ—আমায় রক্ষে কর'—আমায় রক্ষে কর'। আমায় জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি যাবো না কিছুতে—আমায় মেরে ফেললেও—

টনক নড়ে উঠলো রামপণ্ডিতের। ব্রহ্মতেজ গর্জ্জে উঠলো দেহে—সেই রাত দশটার সময়—দারুণ শীতে—ঘন কুয়াসার মাঝে। হাঁকার দিলেন রামপণ্ডিত, এই গাড়ী—রোখো—রোখো—

গাড়োয়ান ছিপটি লাগালে ঘোড়ার পিঠে। গাড়ী ছুটতে লাগলো আরও বেগে। রামপণ্ডিত উপায়ান্তর কিছু না পেয়ে পরণের কাপড়-খানা একটু বাগিয়ে নিয়ে নগ্ন গাত্রে একেবারে ছুটতে লাগলেন গাড়ীর পিছু পিছু।

গাড়ীর ভেতর মেয়েটি চেঁচাচ্ছে তখনও, ওগো, আমায় রক্ষে কর' —কে কোথায় আছ, রক্ষে কর'।

রামপণ্ডিত একেবারে পিছনদিক থেকে ছুটে এসেই ঘোড়ার মুখের লাগাম সজোরে চেপে ধরলেন বাঁ হাতে। ঘোড়া সামনের পা দু'টো চকিতে উঁচু ক'রে তুলে ধরে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লো। গাড়ী গেল থেমে—ঠিক এই ল্যাম্পপোস্টটার সামনেই।

রামপণ্ডিতের গলা পেয়ে পাড়ার অনেকেই বেরিয়ে পড়লো যে যার বাড়ী থেকে। ছুটে এল ল্যাম্পপোস্টটার কাছে।

বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রামপণ্ডিত গাড়োয়ানকে, সোয়ারি কোন্ হ্যায় ?

গাড়োয়ান বললে, বাবু হ্যায়—আউরাত্ হ্যায়।

—আউরাত্ রোতা কাহে ? দরজা খুলো—জলদি দরজা খুলো।

গাড়ীর ভেতর মেয়েটি তখন কেমন ভরসা পেয়ে আরও চেঁচাতে লাগ্‌লো, ওগো, আমায় রক্ষে কর'—আমায় রক্ষে কর'।

রামপণ্ডিত গাড়ীর দরজা ফেললেন খুলে। খুলতেই মেয়েটি একেবারে যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল গাড়ীর ভেতর থেকে। এই ল্যাম্পপোস্টের সামনে রামপণ্ডিতের দু'পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে একেবারে অঝোর নয়নে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো! বলতে লাগলো, ওগো, তুমি আমার ধম্মবাপ—আমায় রক্ষে কর' তুমি—আমায় রক্ষে কর'।

কি কাণ্ড রে বাবা! একটা এগারো বারো বছরের মেয়ে! কেঁদে কেঁদে মুখ চোখ ফুলিয়ে লাল ক'রে ফেলেছে। বেশ ফর্সা টুকটুকে দেখতে। পরনে একখানা লাল রঙের দামী ডুরে সাড়ী। গা ভর্ত্তি গহনা। আল্‌তা-পরা পায়ে রূপোর মল। এত সাজসজ্জা—সব নয় ছয় হয়ে গেছে দুঃখের তাপে। হায় রে হায়—যেন সীতার অশোক বনে আগুন লেগেছে রে!

কি হয়েছে মা—কি হয়েছে, মা? চুপ করো—চুপ করো—কেঁদ না।

রামপণ্ডিত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কে শোনে সে সান্ত্বনা! মেয়েটা যেন একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। আছাড়ি-পিছাড়ি কাঁদতে

লেগেছে। মুখে ঐ এক কথা—ওগো, তুমি আমার ধম্মবাপ—তুমি আমায় রক্ষে কর'।

থাকতে পারলেন না রামপণ্ডিত। কচি মেয়েটাকে সাদরে কোলে তুলে নিলেন। মেয়েটির মাথার সোনার টিক্‌লি গেল সরে'—ফুটে উঠলো লাল টকটকে সিঁদুর রেখা।

গাড়ীর ভেতর একজন ছোক্‌রা ছিল বসে। সে ভয়ে একেবারে কাঁচুমাঁচু হয়ে গেছে। এত কাণ্ড ঘটবে পথে সে ভাবতেই পারে নি। পাড়ার লোকেরা তাকে জোর করে টেনে নামালে। পাড়ার বিভূতি রায় ছিল—সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসাবাদের অপেক্ষা রাখলে না। ছোকরাটির ঘাড়ে একটা সজোরে রদ্দা দিয়ে বলে উঠলো, কাদের বাড়ীর বৌ বার ক'রে নিয়ে যাচ্ছিস্ রে, শালা। পাঁচ হাত ঠিক্'রে পড়্‌লো ছোকরাটি। সে কিছু বলবার আগেই বিভুতি রায় তড়াক্ করে গাড়ীর চালে উঠে গাড়োয়ানের হাত থেকে ছিপ্‌টিটা কেড়ে নিয়ে হাঁকায় আর কি! হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন রামপণ্ডিত। জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটিকে, মা, তোমার নাম কি?

—উমা।

—কোত্থেকে আসছো এই রাতের বেলা?

—গড়পার থেকে।

—ও লোকটা কে হয় তোমার?

উমা কিছু বলে না। দুহাতে চোখ মোছে।

জিজ্ঞেস করলেন রামপণ্ডিত, কোথায় যাচ্ছিলে?

উমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে উঠল, শ্বশুরবাড়ী।

যাঃ-ব্বাবা—আর কি! মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো সকলে। কি লজ্জা—কি লজ্জা! ছেলেটি উমার স্বামী। বাগবাজারে উমার শ্বশুরবাড়ী। ছেলেটি তার বৌকে নিয়ে যাচ্ছিল

অমন জোর ক'রে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। উমার মা মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে জামাইয়ের সঙ্গে। পথে ঘটলো শেষে এই বিভ্রাট্। উমা তার ঠাকুরমার খুব আদরের নাত্নী। বছর দেড়েক হ'ল বিয়ে হয়েছে। ঠাকুরমাকে ছেড়ে উমা কিছুতেই যাবে না। কান্নাকাটি অনেক করেছে বাড়ীতে। কিন্তু শোনে নি কেউ। জোর ক'রে গাড়ীর মধ্যে তুলে দিয়েছে।

হ্যাঁগো—তখন ন' দশ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হ'তো। প্রথম শ্বশুরঘর করতে যাওয়া তাদের ছিল প্রাণান্তকর বেদনা। কাঁদতো—মাথা খুঁড়তো—ঢিপি ক'রে তুলতো কপাল। পাঁচজনে এমনি জোর ক'রে মেয়ের মন বসাতো শ্বশুরঘরে। তারপর মাটিতে শেকড় ধরে যেত' যখন—তখন আর কারোয় কিছু বলতে হ'তো না। এ এখনকার কথা নয়। তখন আগে হ'তো বিয়ে—তারপর হ'তো ভালোবাসা। এখন আগে হয় ভালোবাসা—তারপর হয় বিয়ে। গতি গেছে উল্টে—বিধি গেছে পাল্টে। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ—কাজ কি তার বিচারে! তবে হাসিকান্না দু'য়েতেই আছে। আগে কান্নার ওপর হাসি ভাসতো পদ্মফুলের মত—দেখতে লাগতো ভালো! এখন কান্নার দাপটে আর জল ঝরে না চোখে। শুকিয়ে যায় সেই স্বপ্নে-বোনা হাসি—তারপর বুকখানা চড়্চড়্ করতে থাকে মরুভূমির মত হা-হুতাশের দমকা হাওয়ায়।

যাক্—সমস্ত শুনে রামপণ্ডিত বললেন, আচ্ছা মা, তোমায় আজ আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। আমার বাড়ীতে থাকবে চলো। ঝি-জামাইকে খাইয়ে দাইয়ে আদর আত্তি ক'রে কাল বিদায় দেব।

উমা অমনি ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলে উঠলো, আমি কালকেও

যাবো না—পরশুও যাবো না—তার পরদিনও যাবো না। আমি ঠাকুরমার কাছে যাবো।

—আচ্ছা—আচ্ছা—তাই হবে—তাই হবে।

এই বলে' সান্ত্বনা দিলেন রামপণ্ডিত। উমার বর সেই ছেলেটি কিছুতেই যাবে না। বিভূতি রায়ের রদ্দা খেয়ে তার কেমন ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। অভিমান জেগেছে খুব। চলে যাচ্ছিল—রামপণ্ডিত খপ্ করে ছেলেটির হাত ধরে ফেললেন। রোদনমুখী উমাকে কোলে নিয়ে আর এক হাতে ছেলেটির হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে গেলেন। ঐ রাতেই শেষে বিভূতি রায়কে সেই ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী ক'রে পাঠিয়ে দিলেন উমার বাপের বাড়ি গড়পারে। সমস্ত শুনে সেখানে মেয়েরা গালে হাত দিয়ে বলে উঠলো, ও মাগো—উমার কাণ্ড শোন'।

তারপর বেশ হ'লো। রামপণ্ডিতকে উমার খুব ভালো লাগলো। পরদিন উমার বাপের বাড়ি থেকে উমার ঠাকুরমা এল—মা এল—আরও এল অনেকে। বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল রামপণ্ডিতের সঙ্গে তাদের।

এসব হাসবারই কথা—এ হাসিতে জ্বালা নেই। বেশ হাল্কা ফিকে রস। ল্যাম্পপোস্টের সেই সব মনে পড়ছে—তাই হাসছে।

সেই উমা কত বড়টি না পরে হ'লো। পাঁচটি ছেলে মেয়ের মা হয়ে কেমন শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে লাগলো। মাঝে মাঝে আসতো এখানে রামপণ্ডিতের বাড়ীতে—তার ধম্মবাপের সঙ্গে দেখা করতে। রামপণ্ডিত চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। উমা ছিল যেন ঠিক তাঁর নিজের মেয়ে। রামপণ্ডিত যেতেন বাগবাজারে; দেখে আসতেন তাঁর মেয়েকে—স্নেহাদর ক'রে ফিরতেন তাঁর নাতি-নাত্নীদের।

সেদিন বলেছিল ল্যাম্পপোস্টটা।

—বার কর' দেখি একটা এরকম লোক—রামপণ্ডিতের মত আজকালকার দিনে। আর খুঁজতে হবে না গো—খুঁজতে হবে না। কোথাও পাবে না। স্বার্থের দ্বন্দ্বে মজ্‌গুল আজ সকলে। নিঃস্বার্থ-পরতার গুগ্‌গুল্ পুড়িয়ে সারা পাড়ায় সুবাস ছড়াবে কে!

কত স্রোতই গেল ভেসে এই ল্যাম্পপোস্টটার সাম্‌নে দিয়ে! নিশানা রেখে যায় নি কিছু। রেখে গেছে কেবল তার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা—এই বহু কালের ল্যাম্পপোস্টটা।

হ্যাঁ—রামপণ্ডিতের কথা আরও অনেক জানা আছে ওর। কি সুন্দর চেহারা ছিল রামপণ্ডিতের। বুকের পিঠের পেশি যখন ফুলিয়ে দাঁড়াতেন—কি চমৎকারই না দেখতে হ'তো তখন তাঁকে। সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকতো। ডম্বল-মুগুর ভাঁজেন নি—ডন্ বৈঠক দেন নি—তবু শরীরের গঠন তাঁর কি সবলই না ছিল! গায়ে কখন' জামা পরতেন না। একখানা সাদা উড়ানি ব্যবহার করতেন উপর অঙ্গে—যদি প্রয়োজন হ'তো। শীতকালে দারুণ শীতে বড় জোর একখানা পাত্‌লা এণ্ডির চাদর। নিত্য পদব্রজে গিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে আসতেন। ঐটি তাঁর ছিল একেবারে বাঁধা। জপ-আহ্নিক করতেন অনেকক্ষণ ধরে। সকলেই বলতো—রামপণ্ডিতের দেহ ছিল যোগ-সাধনার। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যই ছিল তাঁর শক্তি। নইলে অমন ক'রে ছুটে এসে ছুটন্ত ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে একেবারে তৎক্ষণাৎ থামাতে পারে কি কেউ!

রামপণ্ডিতের কথা অনেক জানে ল্যাম্পপোস্টটা। শুনে রাখো আর একটু কাহিনী।

তখন অনুকূল নন্দী বেঁচে আছেন। রামপণ্ডিতের রুদ্রমূর্তি সেই একবার প্রকাশ পেয়েছিল পাড়ায়। সেদিনের ঘটনা জানে এমন লোক আজ আর কেউ বেঁচে নেই এই ল্যাম্পপোস্টটা ছাড়া। রামপণ্ডিতের সে মূর্তি মনের চোখে ভেসে উঠলে আজও ল্যাম্প-পোস্টটার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে যেন ভয়ে। হয়েছিল কি শোন।

রামপণ্ডিত তাঁর দাদার সংসারে থাকেন আর পাঠশালা চালান। রামপণ্ডিতের দাদা বাড়ির একতলায় তিনখানা ঘর এক ভদ্রলোককে ভাড়া দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক সেখানে সপরিবারবর্গ বাস করতেন। ঢুকতেই ডানদিকের ছোট ঘরখানাই রামপণ্ডিতের ঘর। একতলার একখানা ঘরে রামপণ্ডিত থাকেন আর বাকী সমস্ত একতলাটায় সেই ভদ্রলোকের সংসার। ভদ্রলোকটি কি কারণে জানি না একবার এক কাবুলিওয়ালার কাছে দু'শ টাকা ধার করেন। মাঝে মাঝে কাবুলিওয়ালাটা আসে আর লোকটির নিকট হতে প্রাপ্য সুদ নিয়ে চলে যায়। লোকটির খুব টানাটানি পড়েছিল সে-সময়। ক'মাস সুদ দিতে পারেন নি। কাবুলিওয়ালাটা এসে সদর দরজায় লাঠি ঠুকে তাগাদা ক'রে ক'রে চলে যায়। শেষে একদিন তার আর একজন দেশওয়ালিকে সঙ্গে ক'রে আনে। উঁচু নীচু কথা বলছিল সদরে দাঁড়িয়ে। সকাল বেলা—রামপণ্ডিত গঙ্গাস্নান সেরে এসেছেন। পূজা-আহ্নিক সেরে চণ্ডীপাঠ করছিলেন। কাবুলিওয়ালাদের তাগাদায় তাঁর চণ্ডীপাঠে বিঘ্ন ঘটছিল। ঘরের বাইরে এসে তাদের বললেন, আবি হিঁয়াসে নিকালো।

কাবুলিওয়ালারা শুনলেনা না—তম্বি করতে লাগলো। বাঙালী

লোকদের জাত তুলে কি বিড়্ বিড়্ ক'রে বলে যেতে লাগ্‌লো। রামপণ্ডিত তড়াক্ করে একজনকে ধাক্কা দিয়ে অমনি বলে উঠলেন, নিকালো আবি।

তারপর একবার এটাকে ধাক্কা দেন আর একবার ওটাকে ধাক্কা দেন। এমনি করতে করতে দুটোকে এই ল্যাম্পপোস্ট পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে এলেন। রামপণ্ডিতকে আক্রমণ করবার সুযোগই পায় না কেউ। শেষে একজন একটু পিছিয়ে গিয়ে সেরেফ্ পুস্তু ভাষায় গাল দিতে দিতে হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরলে। আর যায় কোথা! পুস্তু ভাষা না বুঝলেও রামপণ্ডিত বুঝতে পেরেছিলেন উক্তিগুলো একেবারে কাব্‌লি খিস্তি। আর রাগটা দাবিয়ে দাবিয়ে সহ্য করতে না পেরে তার গালে ডান হাতখানা ঘুরিয়ে এমন সজোরে সটাং করে একটা চড়্ কশালেন যে, সে কাবুলিওয়ালাটা চরকি বাজির মত ঘুরে গিয়ে 'ও-ওফ্ বাপস্' বলে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লো ঐ ল্যাম্পপোস্টটার গোড়ায়। রামপণ্ডিত আর একজনের দিকে চকিতে মুখ ঘুরিয়ে চাইতেই—সে পন্ পন্ করে ছুটে পালালো। পাড়ার পাঁচজন ছুটে গেল রামপণ্ডিতকে ধরতে। কিন্তু রামপণ্ডিতের সে-রুদ্রমূর্ত্তি দেখে কারোর সাহস হ'লো না—গায়ে হাত দেয় তাঁর।

লুটিয়ে পড়া কাবুলিওয়ালাটা ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলো, দেখ্‌লেঙ্গা—তোম্‌লোককো দেখ্‌লেঙ্গা।

রামপণ্ডিত বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন, বোলাও তেরা 'কাবুল রেজিমেণ্ট'কো। ফিন্ যব্ হিঁয়া ঘুঁসেগা তো—হাম্ তোম্‌লোককো শির লেঙ্গে।

মাথার এলিয়ে পড়া পাগড়িটা বাঁধতে বাঁধতে কাবুলিওয়ালা চলে গেল মুখে বিড়্ বিড়্ ক'রে কি বলতে বলতে। সেই যে গেল—আর এ মুখো হয় নি। পরে শোনা গেল—ওর দেনা সুদে আসলে

মিটিয়ে দিয়ে এসেছিলেন ভদ্রলোক। পাড়ার মধ্যে আর তাকে আসতে হয় নি।

তারপর রামপণ্ডিত ফিরে যাচ্ছিলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে লেক্ নন্দী মশাই জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে পণ্ডিত মশাই—এত রেগেছেন কেন ?

মুহূর্ত্তে রামপণ্ডিত একেবারে সহজ হয়ে গেলেন। মৃদু হেসে নন্দী মশা'য়ের কথার জবাব দিলেন। বললেন বেশ রসিকতা ক'রে, একটি গান্ধারবাসী শিষ্য করলুম এতদিনে, নন্দীমশাই। বেটার কানে মন্ত্র দিলুম। আর কোনদিন গুরুপাড়ায় পা দেবে না। বেটাদের গুরুভক্তি খুব—দেখে নেবেন।

সকলে তা' শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

এমনি অনেক ছোট বড় কথা আছে রামপণ্ডিতের তোলা ল্যাম্পপোস্টটার বুকে। শোন আবার কি বলেছিল সে।

কুণ্ডুরা থাকতো দশ নম্বর বাড়িতে। এমন দিন কাটতো না—যেদিন শাশুড়ী বৌয়ে বাড়িতে ঝগড়া হতো না। একেবারে বাড়ির ছাতে কাক চিল বসতে পারতো না—এমন ঝগড়া চলতো। দেবেন কুণ্ডুর পুত্রবধূ নির্ম্মলা একদিন ভর দুপুরে এক কাণ্ড ক'রে বসলো। শাশুড়ীর সঙ্গে এক পশলা চেঁচামেঁচি ক'রে ঘরে ঢুকে খিল দিলে নির্ম্মলা। দু'ঘণ্টা আর দরজা খোলে না। দেবেন কুণ্ডুর ছেলে বাড়ি ছিল না। সেদিন সকাল বেলাতেই গেছে শ্রীরামপুর—তার বোনকে আনতে।

বেলা তিনটের সময় হৈ-হৈ পড়ে গেল দেবেন কুণ্ডুর বাড়িতে। কে নাকি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছে, নির্ম্মলা গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঝুলছে। কান্নাকাটি হাঁক-ডাক পড়ে গেল অমনি। কেউ সাহস ক'রে ঘরের দরজা ভেঙে ঢুক্তে পারছে না। পাড়ার

লোক সব একেবারে ঝেঁটিয়ে পড়লো দেবেন কুণ্ডুর বাড়িতে। উঁকি মেরে দেখে কেউ কেউ আবার সরে পড়লো ভয়ে।

খবর পেয়েই ছুটে এলেন রামপণ্ডিত। এসেই বললেন, কি আশ্চর্য্য—দরজাটা কেউ আর ভাঙতে পারছো না—আচ্ছা যাহোক! হয়তো এখনও প্রাণ থাকতে পারে; বৌটাকে তো বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে।

ব'লেই ঘরের দরজায় মারলেন সজোরে দুই লাথি। ব্যাস্—ভিতরের খিলটা একেবারে দু'আধখানা হয়ে ছিটকে পড়লো ঘরের মেঝের ওপর। রামপণ্ডিত সবেগে ঘরে ঢুকে পড়লেন। কোন কথা নয়—একেবারে নির্ম্মলার পা দুটো বাঁ হাত দিয়ে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে দেহটা একটু উঁচুতে তুলে ধরলেন। কী বিভৎস মুখ তখন হয়ে গেছে নির্ম্মলার! চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে একেবারে বেরিয়ে পড়ছে যেন।

চেঁচিয়ে বললেন রামপণ্ডিত, কড়িকাটের দড়িটা কেটে দাও শীগ্‌গীর।

কিন্তু শীগ্‌গীর কাটে কে! কেউ আর এগুতে চায় না ভয়ে—পিছিয়ে আসে দরজার বাইরে। শেষে বিরক্ত হয়ে রামপণ্ডিত ঐ অবস্থায় নির্ম্মলাকে জড়িয়ে ধরে একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে কড়িকাটের গায়ে দায়ের কোপ দিলেন দড়িটার ওপর। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে নিলেন নির্ম্মলার দেহ। মেঝের ওপর শুইয়ে দিয়ে গলার ফাঁস দিলেন খুলে। পরীক্ষা ক'রে দেখলেন—আর কোন আশা নেই। খুব অল্পক্ষণ হলো প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে নির্ম্মলার। আর কি করতে পারেন রামপণ্ডিত! করবার আর কিছু নেই। বিরক্ত হয়ে চলে আসবার সময় রাগের মাথায় দেবেন কুণ্ডুর পরিবারকে ব'লে এলেন, তুমি আর অমন ক'রে গালে হাত দিয়ে

বসে আছো কেন গো। বৌয়ের গলার দড়িটা নিয়ে ঐ পাশের ঘরে ঝুলে পড়'না গিয়ে। বেশ ভালোই হবে। একলাটি আর ঝগড়া না ক'রে থাকবে কেমন ক'রে? বৌমা যেখানে গেছে—তুমিও সেখানে যাও। ঝগড়া ক'রে দুজনে আরাম পাবে একত্রে।

তারপর থানা পুলিশ। লাশ নিয়ে যাবার গাড়ী এল—ময়না-তদন্ত হবে। পুলিশ লাশ ছাড়বে না জ্বালাবার জন্যে। নিয়ম নেই। ওপরওলার অর্ডার আনতে পারো ভালো; নইলে বরাবরের প্রথা মেনে চলতে হবে তাদের। ঘুষ খাবার পথ নেই—জানাজানি হয়ে গেছে ভীষণ।

সন্ধ্যে তখন অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। গ্যাস কোম্পানির লোক এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে ল্যাম্পপোস্টটার মাথায়। ডোম দু'জন এল লাশটানা গাড়ী নিয়ে। গাড়ী এনে দাঁড় করালে এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে—আলোর তলায়। ওদিকটায় অন্ধকার বড়। দশ নম্বর বাড়ীটা তো একেবারে ডুবে গেছে সকল রকমে নিবিড় কলুষ-আঁধারে।

ল্যাম্পপোস্টটা দেখছিল স্থির চোখে চেয়ে। কোনওরকম কাঁপন ধরে নি তার শুভ্র দৃষ্টিতে। একখানা সাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে নির্ম্মলার মৃতদেহ ব'য়ে নিয়ে এল ডোমেরা। এইখানে সেটা চাপালে গাড়ীতে। তারপর হড়হড়্ ক'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল গাড়ীটা সোজা বড় রাস্তা দিয়ে সেখানে, যেখানে ময়না-তদন্ত হবে নির্ম্মলার লাশটার।

পরের দিন বৈকালে লাশ জ্বালানো হ'লো। কিন্তু পুলিশ কেশ চলেছিল তারপর অনেক দিন ধরে। 'সমন' এল রামপণ্ডিতের নামে—সাক্ষ্য দিতে হবে আদালতে হুজুরের সামনে। আচ্ছা আপদ্—এড়াবার জো নেই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। সমন পেয়ে না গেলে

রামপণ্ডিতের নামে ওয়ারেণ্ট বেরুতে পারে। কি আর করবেন—রামপণ্ডিত আদালতে হাজির হলেন। বড় মজা হয়েছিল সেদিন। রামপণ্ডিত কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন। হলফ্ নেওয়া শেষ হয়েছে তাঁর। সরকারপক্ষের উকিল তাঁকে জেরা করতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা পণ্ডিত মশাই—যখন নির্ম্মলা গলায় দড়ি দিয়েছিল, তখন আপনি কি করছিলেন?

হুঁ-হুঁ—পাঠশালার পণ্ডিত বলে' রামপণ্ডিতকে মুখ্যু ভেব না। নাইবা জানলেন ইংরিজি। বুদ্ধির চক্‌চকে ধার রামপণ্ডিতের বরাবরই ছিল।

বললেন, কোন্ সময়টা নির্ম্মলা গলায় দড়ি দিয়েছিল—তাতো জানি না, মশাই। জানলে বলতে পারতুম—সে সময় আমি কি করছিলুম।

সরকারপক্ষের উকিল অমনি চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন, সে কি পণ্ডিতমশাই—আপনি তো লাথি মেরে দরজা ভেঙে প্রথম ঢোকেন।

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ—আমি লাথি মেরে যখন দরজা ভেঙে ফেলি, ঠিক সেই সময় তো আর বৌটা গলায় দড়ি দেয় নি। দিয়েছিল নিশ্চয় অনেক আগেই। চেঁচামেঁচি শুনে খবরটা যখন পাই—তখন আমি আহারান্তে তামাক সেবা করছিলুম।

একটা ঢোক গিললেন উকিল মশাই অকারণে।

পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা পণ্ডিতমশাই, নির্ম্মলা নিজে গলায় দড়ি দিয়েছিল—না—অন্য কেউ আগে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলে অমন ক'রে ঝুলিয়ে রেখেছিল ঘরের ভেতর।

রামপণ্ডিত কিছুমাত্র না ভেবে উত্তর দিলেন, সম্পূর্ণ অবান্তর প্রশ্ন। আমি দরজা ভেঙে যখন ঘরে ঢুকি, তখন ঘরের মধ্যে কারোয়

দেখতে পাই নি। তা যদি কেউ ক'রে থাকে, তাহলে সে লোকটা দরজায় খিল দিয়ে পালালো কেমন ক'রে—জানালাগুলো তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

এবার একটু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন উকিল মশাই, আচ্ছা—পণ্ডিতমশাই, এত লোক থাকতে আপনি কেন দরজা ভেঙে দড়ি কেটে লাশ নামাতে গেলেন।

একটু বিকৃত কণ্ঠে রামপণ্ডিত বললেন, আঁজ্ঞে মশাই—বড় অপরাধ হয়ে গেছে। তা জিজ্ঞেস করি, এমন অবস্থায় কি করতে হবে?

—কেন—থানায় খবর দিলেন না কেন? পুলিশের লোক গিয়ে যা করবার তাই করতো।

রামপণ্ডিতের তখন বেশ বয়স হয়েছে—পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হবে। সরকারপক্ষের উকিলের বয়স তার তুলনায় খুব অল্প।

আর থাকতে না পেরে রামপণ্ডিত ফস্ করে অমনি বলে উঠলেন, তুই থাম্, বাবা। ওকালতি আর তোকে করতে হবে না—দেশে গিয়ে ধান চাষ করগে যা। একটা পাড়ার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে—তক্ষুনি দড়ি কেটে তাকে নামিয়ে দেখতে হবে না, প্রাণটা তার বাঁচে কি না! থানায় খবর দোব—নামধাম ঘটনা লেখাবো; ইন্‌সপেক্টার বলবেন—তারপর হাতে খৈনি ডল্‌তে ডল্‌তে পুলিশ পাহারওলা আসবে—ততক্ষণে তো তার শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করতে বসতে হবে। হেঃ—যত্‌তো সব—আর কি জিজ্ঞেস কর্‌বি—তাড়াতাড়ি কর্ বাবা; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিকে আমার কোমর ধরে যাবার জো হয়েছে।

বিচারক জজের আসনে বসে স্বয়ং হেসে উঠলেন—অন্য সকলে তো হাসলোই। রামপণ্ডিতকে আর দাঁড়াতে হল' না—সসম্মানে তিনি কাঠগোড়া থেকে নেমে যাবার হুকুম পেলেন।

এমনি ছিল রামপণ্ডিত। ছিয়াশি বছর বয়সে একদিন হঠাৎ পাড়ার সকলের কাছে বিদায় নিয়ে কাশী চল্‌লেন। সকলে বললে, সে কি পণ্ডিতমশাই! আপনি চলে গেলে—আমরা থাকবো কেমন ক'রে!

রামপণ্ডিত হাসিমুখে বল্‌লেন, আর তো পারছি নি, বাবা, থাকতে। বাবা বিশ্বনাথের ডাক এসেছে যে।

রামপণ্ডিত চলে যাবার সময় এই ল্যাম্পপোস্টটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একবার। এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। অনেকদিনের স্মৃতি—অনেক দিনের মায়া কেমন যেন তাঁকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছিল, যেমন ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে রাতের সুখস্বপন মানুষের সুপ্ত চেতনাকে। মুক্ত পুরুষ ছিলেন রামপণ্ডিত। বাঁধতে তাই তাঁকে কিছুতেই পারলো না সংসারের ভালোবাসা। তাঁর নিজের বুকের ভালোবাসা ছিল এত বিরাট যে, এই সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তা' ধরতো না। অনেক সময় তা' আপনি উছলে উছলে গড়িয়ে পড়তো—এ পাড়ার সকল জায়গায় তার ধারা বয়ে যেত' স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে।

আর রইলেন না। ইতর ভদ্র নির্বিশেষে সকলকে প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে রামপণ্ডিত কাশী চলে গেলেন। তারপর শোনা গেল, তেরাত্র কাশীবাস ক'রে একদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সজ্ঞানে কাশীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তিনি।

এ কি বাপু আজকের কথা! তখনও বনমালী শিকদারের বাড়ী ওঠে নি। নিখোঁজ হয়নি শ্রীনাথ ময়রার বৌ প্রমীলা। বোস বাড়ী থেকে রাতের আঁধারে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ লুকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে যায় নি ঐ ল্যাম্পপোস্টটার কাছে একটা ঘোঁজের মধ্যে কে জানে কোন্ বিধবার কলঙ্ক চাপ্‌তে!

আজ যেখানটায় বনমালী শিকদারের বাড়ী উঠেছে একেবারে তেমাথার মোড়ে, পূর্ব্বে ওখানটায় নিতাই মজুমদারের মুড়ি মুড়কি চিঁড়ে বাতাসার দোকান ছিল—ঠিক একেবারে ল্যাম্পপোস্টটার গায়েই। বুড়ো নিতাই মজুমদার এল শান্তিপুর থেকে। তাকে দেখেছে ল্যাম্পপোস্টটা—মনে আছে তার কথা। খানিকটা বললে সেদিন—শুনলুম তা'।

হ্যাঁ—বুড়ো নিতাই মজুমদার এল শান্তিপুর থেকে। গলায় তুলসীর মালা—কপালে হরিচন্দন। মাথা ন্যাড়া। চোখে সুতো-বাঁধা কাঁচের চশমা। কেউ কোত্থাও নেই তার। একটি মাত্র বিধবা মেয়ে ছিল বাপের কাছে শেষ পর্য্যন্ত। তা সেও শান্তিপুরে শান্তি পেয়েছে। ঘর বাড়ি বাগান সব কিছু বেচে দিয়ে নিতাই বোষ্টম বাকি জীবনটা বৃন্দাবনে গিয়ে কাটাবে—এই মনে ক'রে শান্তিপুর থেকে চলে এল। কিছুদিন ছিল কলকাতার চাল্‌তাবাগানে। তারপর কি খেয়াল গেল—এইখানে এসে টিনের ছাদওলা ঘর একখানা ভাড়া নিয়ে বসলো। দেখতে দেখতে দোকান ফাঁদলে। মুড়ি আনলে, মুড়কি আনলে—আনলে চিঁড়ে—বানালে বাতাসা। আর বৃন্দাবন-বাসী হতে পারলে না নিতাই। দোকানঘর বেশ সাজিয়ে তুললে ক্রমে ক্রমে। ঐ দোকানঘরের মধ্যেই তার শো'য়া বসা খাওয়া কেনা বেচা সবই। বেশ ছোট ছোট বাতাসা তৈরি করতে পারত নিতাই। একোগুড় মাটির তিজেলে জ্বাল দিয়ে একটা কাটি ক'রে ফেটিয়ে ফেটিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে তরল গরম গুড় ফোঁটা ফোঁটা ফেলে

যেত পরিষ্কার তালপাতার চেটাইয়ের ওপর। আর অমনি দেখতে দেখতে সেগুলো বাতাসা হয়ে যেত। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাকে 'নিতাই মামা' বলে ডাকতো। সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত নিতাই কেমন ক'রে বাতাসা বানায়। তাদের দেখতে ভারি মজা লাগতো। গরম বাতাসা তুলে তুলে দিত ছেলে মেয়েদের হাতে। খুশিতে মন ভরে যেত তাদের। নিতাই ছেলেদের ডাকতো 'গৌর' বলে—মেয়েদের নাম দিয়েছিল 'রাধারাণী'। এই 'গৌর-রাধারাণী'র দল তার দোকানে এসে দাঁড়ালে নিতাই খুব আনন্দ পেত। বলতো—এস আমার গৌর-রাধারাণীর দল।

এক একদিন জিজ্ঞেস করতো তারা, কৈ নিতাই মামা—আজ আর বাতাসা তৈরি করবে না ?

নিতাই বলতো, করবো গো করবো—দাঁড়াও, আগে গুড় জ্বাল দিই।

তারপর ছেলে মেয়েদের প্রত্যেকের হাতে মুড়কি মুড়ি বাতাসা কিছু না কিছু দিয়ে অতিথি সৎকার করতো নিতাই। ছেলে মেয়েরা হৈ-হৈ ক'রে চেঁচামেঁচি করতো। মুখে বাতাসা পুরে চুষতে চুষতে এই ল্যাম্পপোস্টটাকে দু'হাতে ধরে খেলার ছলে বন্ বন্ ক'রে ঘুরতো। বুড়ো নিতাই হাসিমুখে চেয়ে চেয়ে দেখতো তাদের আর নিষ্কলুষ আনন্দে চোখ দুটো তার চিক্ চিক্ করে উঠতো। সে-সময় কোন খদ্দের এসে কিছু চাইলে নিতাই অমনি বলতো, দাঁড়াও না বাবা—দিচ্ছি। গোলকধামের খেলাটা ওদের আগে দেখি একটু।

খুব ভোরে উঠতো নিতাই—আঁধার থাকতে। মুখে চোখে জল দিয়ে একজোড়া ছোট খঞ্জনি হাতে নিয়ে ঠুন্ ঠুন্ ক'রে বাজিয়ে গৌরবন্দনা গাইত। রাত্রে সব কাজ শেষ হলে দোকানটি বন্ধ ক'রে চৈতন্য ভাগবত পড়তো বেশ নরম গুণ্ গুণে সুর দিয়ে। নিতাই

একবেলা রাঁধতো আর এক বেলা যা হোক মুড়ি মুড়কি চিঁড়ে দু'মুটো গালে ফেলে ঢক্ ঢক্ ক'রে জল খেয়ে নিত খানিকটা। বেশ প্রাণখোলা সরল লোক ছিল বুড়ো নিতাই মজুমদার।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো ঠাট্টা ক'রে, কৈ নিতাই—বৃন্দাবনে যাচ্ছ কবে? ঘর ছেড়ে বৈরাগী হ'তে গিয়ে শেষে দোকান ফেঁদে ব্যবসায়ী হয়ে পড়'লে!

নিতাই বলতো, কোন্ দুঃখে আবার বৃন্দাবন যাবো—আমার এই তো বৃন্দাবন।

পরক্ষণেই সুর ক'রে হাততালি দিয়ে বুড়ো নিতাই অমনি গেয়ে উঠতো, 'ওগো, বৃন্দাবনে রসিক ময়রা দোকান খুলেছে'।

খোলা প্রাণের হাসি অমনি আপনি উছলে পড়তো নিতাইয়ের চোখে মুখে।

কেউ আবার একটু ঠোক্কর দিত—বলতো, নিতাই, আর কেন—এবার শেষ বয়সে একটা সেবাদাসী রাখো।

নিতাই তড়াক্ ক'রে জবাব দিত, আমি নিজেই গোরাচাঁদের সেবাদাসী—আমার আবার সেবাদাসী কি ক'রে হবে!

এই ব'লেই নিতাই ফোগ্‌লা দাঁতে হো-হো ক'রে হেসে উঠতো। ভেসে যেত অপরের ঠাট্টা বিদ্রূপ নিতাইয়ের সেই হাসির স্রোতে।

এ-হেন নিতাইকে একদিন কি অপমানটাই না করলে ভবেশ পালিত। ঐ সামনের বোস বাড়িতে ভাড়াটে থাক্‌তো ভবেশ পালিত। ট্যাঁকশালে কাজ করতো। আর সকলকে বলে বেড়াতো, কলকাতায় যারা ঘরের মটর চড়ে বেড়ায়, তারা প্রায় সবাই তার আত্মীয়—হয় ভগ্নীপতি না হয়তো মেসোমশাই, পিসেমশাই। ভবেশ পালিতের শ্বশুর থাকতো দিল্লীতে সরকারী কাজে। সেই শ্বশুরের পরিচয় দিত সে যখন তখন স্থানে অস্থানে। বলতো—

আমার শ্বশুর খাস দিল্লীতে খোদ লাটসাহেবের সঙ্গে কাজ করেন। সাহেব সুবোদের সঙ্গে তাঁর মেলা মেশা—ডিনার খান—পার্টিতে যান—শিকারে বেরোন। ইংরিজি ছাড়া তিনি কথা বলেন না। বিলেতে তাঁর লেখা ফাইল যাওয়া আসা করে। এ হেন শ্বশুরের জামাই ভবেশ পালিত—চালাকি!

বোস বাড়ীতে এক শরিকের অধীনে ভাড়াটে হয়ে আছে অনেক দিন। ভবেশ পালিতের স্ত্রী ছোট মেয়েটাকে নিয়ে একাই দিল্লী কলকাতা করে। চেপে থাকে দু'এক মাস বাপের কাছে দিল্লীতে। পাড়ার কারোর সঙ্গে ভবেশ পালিতের আলাপ নেই। টঁ্যাকশালে কাজে যায়। কাজ থেকে ফিরে এসে সেই যে ঘরে ঢুকলো আবার বেরুবে তার পরের দিন সকালে নাওয়া খাওয়া সেরে টঁ্যাকশালের চাকরীতে। ভবেশ পালিত চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে বসে থাকতো আর জানলা দিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখতো খালি বোস বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের। ভবেশ পালিতের বাইরেটা ছিল বেশ রঙ্ চঙ্ পালিশ করা—ভেতরটা বড় নোঙ্রা। চোখের দৃষ্টি ছিল জঘন্য। তার এই নীচ প্রবৃত্তি মনের গায়ে যেন কুষ্ঠরোগেরই পরিচয় দিত। প্রতিবাদ করলে অমনি ভবেশ পালিত দিল্লীবাসী শ্বশুরের কিংবা মটরচড়া ভগ্নীপতির ভয় দেখাতো। তার এক পিস্‌তুতো শালা কলকাতার পুলিশ অফিসার ছিল। সে-কথা বার বার উল্লেখ ক'রে ভবেশ পালিত বোস বাড়ির অনেককে কারণে অকারণে রাখতো দাবিয়ে।

সেই যে লুকিয়ে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ রাতের অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টটার কাছে ঘেঁাজের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল—সে শিশুর জনক যে ভবেশ পালিত—সেটা বোস বাড়ির কেউ কেউ জানতো। জানে বই কি ল্যাম্পপোস্টটা। ভবেশ পালিতের বৌ

ছিল তখন দিল্লীতে। আসন্নপ্রসবা বৌ—মা তার নিয়ে গিয়ে রাখলে কাছে। এখানে ভবেশ পালিত থাক্‌তো একা চারু বোসের ভাড়াটে হয়ে। চারু বোসের বড় মেয়ে নলিনী—বিধবা হয়েছিল বিয়ের চার বছর পরেই। শালখেয় তার শ্বশুরবাড়ী—পাড়াটা বড় খারাপ। নলিনীকে রাখলে না সেখানে। নিয়ে এল শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে এখানে। বেশ ডাগর মেয়ে—চোখের চাউনিতে মাদকতা আছে। ভবেশ পালিত একদিন দেখলে জানলার ফাঁক দিয়ে এই বিধবা নলিনীকে—নীচের কলতলায় চুল এলিয়ে স্নান করছে। দেখতে তার বেশ ভালো লাগলো। প্রায়ই দেখতো অমন ক'রে চোরের মতন। ভিজে কাপড়ে সপ্‌ সপ্‌ করতে করতে নলিনী চলে যায় ভবেশ পালিতের ঘরের সামনে দিয়ে—তাও দেখলে অনেকবার। কেমন ভেতরটা নাড়া দিয়ে উঠলো ভবেশের—নলিনীরও। পরস্পরের মন এগুতে লাগলো পরস্পরের দিকে—সঙ্গে সঙ্গে দেহও। পরিবার-না-থাকাকালে ভবেশ পালিত হোটেলে খেয়ে অফিস যেত। রাতে খাবার কিনে আনতো—ঘরেই কাজ সারতো।

চারু বোসের সচ্ছল অবস্থা নয়। অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা। আর্থিক সাহায্য করতো মাসে মাসে ভবেশ। নলিনীর মাও মেয়ের 'আঁকশি' দিয়ে ধীরে ধীরে টানলে ভবেশ পালিতকে; নিজের পরিবারভুক্ত ক'রে নিলে। ভবেশের সুবিধে হ'লো। খোরাকি দিতে লাগলো নলিনীর মায়ের হাতে। হাঁড়িতে ঠাঁই পেতে আর বাধা রইলো না কিছু। অত বড় প্রতাপশালী ভবেশ পালিত—দিল্লীতে স্বয়ং বড়লাটের সঙ্গে যার শ্বশুর ঘোরা-ফেরা করে—কলকাতায় মটর চেপে যার ভগ্নীপতিরা মেসো-পিসেরা বেড়ায়—পিস্‌তুতো শালা যার পুলিশ লাইনে ধূমকেতু বিশেষ—তাকে হাতে রাখতে কে না চাইবে? তারপর যা হবার তাই হ'লো। সন্তানবতী

হ'লো নলিনী। ব্যাপারটা কেউ জেনেছে—কেউ জানে নি। কোমর বাঁধলে আতুরি—সংসারের রাতদিনের ঝি। অজ পাড়াগাঁয়ে তার দেশ। সে জানে অনেক—দেখেছে অনেক। কাজ তো খুব সামান্যই ; মোটেই জটিল নয়। সেই বুঝিয়ে দিলে নলিনীর মাকে, এখন চুপ ক'রে থাকলে পরে আর চুপ ক'রে থাকা যাবে না। তখন হৈ-হৈ প'ড়ে যাবে অত বড় বোস বাড়ীতে—নানান ঘরে ঘরে —সারা পাড়ায়। সাম্‌লানো তখন দায় হবে। তার চেয়ে— আতুরি এগুলো ভবেশ পালিতের কাছে। হাত করলে কিছু টাকা। নিজে বাজার গিয়ে বেদের দোকান থেকে কিনলে কি কি শেকড়-মেকড়। ওসব কাজে আতুরির হাত ভালো। তারপর—

হ্যাঁ—কি বলছিল ল্যাম্পপোস্টটা ? সেই বুড়ো নিতাই মজুমদারের কথা—না ! হ্যাঁ—বুড়ো নিতাই মজুমদার। সুতো-বাঁধা চশমা নাকে প'রে বেশ বাতাসা তৈরি করতো, পাতলা ফুটন্ত গুড় কাটি দিয়ে ফেটিয়ে ফেটিয়ে। পাড়ায় তার বাতাসা বিক্রি হ'তো খুব। ছেলে বুড়ো সবাই আদর ক'রে খেত'। পূর্ণিমা রাতে সত্যনারায়ণের পূজো হ'তো অনেক বাড়ীতে। নিতাইয়ের বাতাসার চাহিদা ছিল এত যে, ঐ দিন সে বানিয়ে উঠতে পারতো না। সেই বুড়ো নিতাইকে কি অপমানটাই না করলে এই ভবেশ পালিত—যার শ্বশুর ইংরিজি ছাড়া বাঙ্‌লা ভাষায় মোটে কথাই কইত না।

হয়েছিল কি জানো ! দোলের দিন—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রঙে মেতেছে খুব। হৈ-হৈ করছে টিনের পিচকারি হাতে নিয়ে

পাড়ার মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে বাড়ি বাড়ি। ফাগের খেলা মিটে গেলে নিতাই মজুমদার মঠ তৈরি করতে বসতো দোকানে—চিনির মঠ। কাটের ছাঁচ ছিল অনেক রকমের—হাতি ঘোড়া সেপাই রথ আরও কত কি। দড়িবাঁধা ছাঁচের ভেতর ঢেলে দিত ফুটন্ত চিনির রস। ফেলে দিত ছাঁচগুলো একটা গামলাভর্ত্তি জলের মধ্যে। একটু পরে জল থেকে ছাঁচগুলো তুলে তুলে খুলে ফেলতো কাঠের খাঁচা, আর অমনি বেরিয়ে আসতো সাদা ধব্‌ধবে হরেক রকমের মঠ। সাজিয়ে রাখতো একটা বড় পরাতের ওপর। দল বেঁধে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঐ দিন গিয়ে একেবারে ঘিরে দাঁড়াতো নিতাইকে। এক একটা কাঠের ছাঁচ খোলা হচ্ছে—আর ছেলেমেয়েগুলো সমস্বরে এক একটা বালকসুলভ উদ্দাম উল্লাস প্রকাশ ক'রে উঠছে।

—অ নিতাই মামা—অ নিতাই মামা—আমি ওটা নোব'—আমি ওটা নোব'।

বুড়ো নিতাই মজুমদার হাসতে হাসতে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে এক একটা মঠ তুলে দিত আর দু'হাত তুলে সহজ সরল আনন্দে বলে উঠতো, জয় গৌর—জয় গৌর—হরি হরি বোল্—হরি হরি বোল্।

ছেলেমেয়েরা মঠ হাতে নিয়ে ধেই ধেই ক'রে আনন্দে নাচ্‌তো আর নিতাইয়ের সুরে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠতো, জয় গৌর—জয় গৌর—হরি হরি বোল্—হরি হরি বোল্।

নিতাইয়ের দোকানে সেদিন ছেলেমেয়েদের যা মাতামাতি চলতো, তাতে বিয়ে বাড়ির বাসরঘর হার মেনে যেত—যেমন ক'রে হার মেনে যায় পেঁচার চীৎকার চারিধারে জাগা পাখীর মুখর কাকলিতে—পূব আকাশে ভোরবেলা লাল তুলির দাগ পড়তে না পড়তেই।

ভবেশ পালিত ট্যাঁকশালে যেত সুট্ পরে। একটু সাহেবী ফ্যাসানে থাক্তো ; নইলে তার দিল্লীবাসী সাহেব-সুবো-ঘেঁষা শ্বশুরের মান যেত। একটি সাত আট বছরের মেয়ে ছিল ভবেশের। নাম রেখেছিল 'লিলি'। বাঙালী নাম তার পছন্দ হয় নি। কথায় কথায় ভবেশ প্রায়ই বলতো, এই সামনের মাসে এ বাড়ি ছেড়ে দোব। থিয়েটার রোডে ভালো বাড়ি পেয়েছি—ফ্ল্যাট ভাড়া কর্ছি—ঐখানে গিয়ে থাক্বো। এ পাড়ায় থাকলে যত সব অসভ্য ছেলেমেয়েদের সাথে মিশে নিজের ছেলেমেয়ে খারাপ হয়ে যাবে। দিল্লীর শ্বশুরমশাই তাই বলেছেন।

কিন্তু মাসের পর মাস চলে যায়—থিয়েটার রোডে ভবেশ পালিতের আর ফ্ল্যাট্ ভাড়া করা হয়ে ওঠে না। জিজ্ঞেস করলে বলতো, বাড়ি মেরামত হচ্ছে। দেখে এসেছি, জানলা দরজা পালিশ কর্ছে।

দোলের দিন এই ভবেশ পালিতের মেয়ে লিলি সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলায় মেতে নিতাই মজুমদারের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালো। লিলির হাতে বুড়ো নিতাই একটা চিনির মঠ তুলে দিলে। অন্য অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ-হৈ করতে করতে মঠ চুষতে চুষতে লিলি বাড়ী চলে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে ভবেশ পালিত একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে লিলির মঠ সমেত হাতখানা ধ'রে টানতে টানতে এসে হাজির হ'লো নিতাইয়ের দোকানে। এসেই বললে নিতাইকে সম্বোধন ক'রে, এই রাসকেল্, মেয়ের হাতে মঠ কে দিয়েছে?

নিতাই উত্তর দিলে, আঁজ্ঞে—আমি।

—কেন—কিসের জন্যে ? কে তোমায় দিতে বলেছিল ? পয়সা দিয়ে ও কিনতে এসেছিল কি ?

—আঁজ্ঞে—আজ দোলপূর্ণিমার দিন—পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আনন্দ করতে করতে আসে—আমি তাদের হাতে মিষ্টি দিই। এতে অন্যায়টা কি হয়েছে, বাপু ?

—আলবৎ অন্যায় হয়েছে। ছেলেমেয়ে গুলোর এমনি ক'রে মাথা খাচ্ছ গোড়া থেকে ভিক্ষেবৃত্তি শিখিয়ে।

—আঁজ্ঞে—আপনি এ কথা বল্‌ছেন। কিন্তু পাড়ার অন্য কেউ তো কখনো এমন ক'রে বলেন নি।

একটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ভবেশ। বললে, পাড়ার অন্য সকলে যদি জানোয়ার পশু হয়—তা ব'লে আমিও কি জানোয়ার পশু হব'। খবরদার বলছি—ফের যদি আমার মেয়ের হাতে অমন ক'রে বাতাসা মঠ দেবে তো, আমি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দোব—দোকান তুলে দোব এখান থেকে। জানো—আমার পিসতুতো শালা হচ্ছে লালবাজার থানার পুলিশ অফিসার !

নিতাই সে কথা জানতো না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল ভবেশ পালিতের মুখের পানে।

ভবেশ পালিত ব'লে গেল, বোষ্টমী ফলাচ্ছ এখানে ! যত্‌তো নেড়া-নেড়ীর কাণ্ড !

তারপর হুকুম করলে লিলিকে, দে—ফেলে দে মঠ ওখানে। যত রাজ্যের নোঙ্‌রা জিনিষ ! আমি তোকে সাহেবের দোকান থেকে চক্‌লেট্ কিনে দোব'খন।

লিলি হিতোপদেশ পড়ে নি। না পড়লেও তার সাধারণ জ্ঞান একটু হয়েছে। ধ্রুব বস্তু পরিত্যাগ ক'রে অধ্রুব বস্তুতে মন অভিনিবেশ করতে তাই বেশ কিন্তু বোধ করছিল।

নিতাই অমনি 'আহা-হা' ক'রে উঠলো। বললে, না—না—থাক্ —থাক্—মেয়ের হাতে আনন্দ ক'রে দিয়েছি যখন—

কথাটা শেষ করতে দিলে না বুড়ো নিতাইয়ের। একটা আচমকা ধমক দিয়ে ব'লে উঠলো ভবেশ পালিত, হ্যাত্তোর নিকুচি করেছে আনন্দের!

এই ব'লে লিলির হাত থেকে মঠটা একেবারে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে নিতাইয়ের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলে ভবেশ পালিত। চিনির মঠটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নিতাইয়ের চারিধারে ছড়িয়ে পড়লো টুকরোগুলো। একটা বড় পাথরের ওপর সজোরে আছাড় মারলে যেন বুড়ো নিতাইয়ের বুকের স্নেহ-ভালোবাসাটা। নিতাইয়ের দু'চোখ কেমন যেন ছল্‌ছলিয়ে উঠলো এই সামান্য ব্যাপারের অসামান্য পরিণতিতে। মুখে কিছু বলতে পারলে না। ভবেশ পালিত ম্লানমুখী লিলিকে হিড়্ হিড়্ ক'রে টান্‌তে টান্‌তে বোস্‌-বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল। যেতে যেতে শাসাতে লাগলো নিতাইকে ডানহাতের তর্জ্জনীটা নাড়তে নাড়তে, ফের যেদিন—

তখন বেলা তিনটে বাজলে ফেরিওয়ালারা রাস্তায় বেরুত। রুটিওয়ালারা আসত পাঁউরুটি বিস্কুট নিয়ে—অবাক্‌জলপান ঘুঘ্‌নি নিয়ে ঘুঘ্‌নিওয়ালারা বেরিয়ে পড়তো। তাদের গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারা যেত, বিকেল হয়েছে—তিনটে বেজে গেছে। বাড়ি বাড়ি মেয়েরা অমনি জেগে উঠতো; আর নয়—আর ঘুমুলে চলবে না, ঘর-গেরস্থালির কাজ আছে! এখন আর সেই রকম পাঁউরুটিওয়ালা বা ঘুঘ্‌নিওয়ালাদের দেখা যায় না। তারা সব গেল কোথায়? এ ব্যবসায় কি তারা সব ছেড়ে দিলে! এই ল্যাম্প-

পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে রুটি ঘুঘ্‌নি বেচে তারা অনেক পয়সা নিয়ে গেছে পাড়া থেকে। জানে সব তা' ল্যাম্পপোস্টটা। দিন কয়েক ধ'রে একজন ঘুঘ্‌নিওয়ালা এসেছিল। একটা বিকট বিকৃত কণ্ঠস্বরে হাঁক দিত, চাই ঘুঘ্‌নি—'বিধবা ঘুঘ্‌নি'—চাই 'বিধবা ঘুঘ্‌নি'। বাড়ি বাড়ি যেত—বেশ বিক্রী করত। মেয়েরাই তার বেশি খদ্দের ছিল। সে বলতো মা কালীর দিব্যি নিয়ে, ঘুঘ্‌নিতে সে পঁ্যাজের রস দেয় নি। গঙ্গাজলে সিদ্ধ ক'রে—তবে মসলা দিয়ে ঘুঘ্‌নি বানিয়েছে।

একদিন হ'লো কি—এই ল্যম্পপোস্টের কাছে পাড়ার কুঞ্জমাতাল তাকে ধরলে। রাত্রে ফিরছিল কুঞ্জমাতাল মাল টেনে। বেশ তৈরি অবস্থা। বললে, কি বাবা, বার করতো—দেখি তোমার 'বিধবা ঘুঘ্‌নি' কি আছে। একটু পেসাদ মুখে দিয়ে যাই।

ঘুঘ্‌নিওয়ালা বললে, না-না—এ আপনাদের জন্যে নয়। এ ঘুঘ্‌নি মেয়েদের জন্যে।

কুঞ্জমাতাল ছাড়লে না। তার টিনের বাক্সটা ধ'রে টানাটানি আরম্ভ ক'রে দিলে। শেষে জোর ক'রে এক খাব্‌লা ঘুঘ্‌নি মুখের ভেতর পুরে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলতে লাগলো, কি বাবা—চালাকি পেয়েছ! এই তোমার 'বিধবা ঘুঘ্‌নি'—মেয়েদের জাত মারছো! এ যে দেখছি সিন্নিতে পঁ্যাজের রস দিয়েছ, বাবা। আমি পাড়ার ডাক্‌সাইটে মাতাল, তবু জানো—পাড়ার মধ্যে বেলাল্লাগিরি করি না—মা বোনেরা আছে এখানে। তুমি সেখানে এসে মাম্‌দো বাজি দেখাচ্ছ—'বিধবা ঘুঘ্‌নি' বেচে। আজ তোমার বাকি ঘুঘ্‌নি সমেত তোমায় চট্‌কে খেয়ে ফেল্‌বো।

তারপর তার ঘুঘ্‌নির বাক্স ধ'রে টানাটানি। ঘুঘনিওয়ালা আর শেষ পর্য্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে ঘুঘ্‌নির বাক্স কুঞ্জমাতালের হাতে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। আর কখন' সে এ পাড়া-

মুখো হ'লো না। কুঞ্জমাতাল অবশিষ্ট 'বিধবা ঘুঘ্‌নি'টুকু সমস্তটা খেয়ে খালি টিনের বাক্সটা এই ল্যাম্পপোস্টের তলায় আছড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। পরদিন সকাল বেলা রাস্তা-ঝাড়ুদাররা সে বাক্সটা এখান থেকে তুলে নিয়ে যায়।

এই খবরটা যখন পাড়ায় রটে গেল, তখন পাড়ার বিন্দেঠাকরুণ হঠাৎ কলতলায় উবু হয়ে বসে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে লাগলো। আর গাল পাড়তে লাগলো মুখে সেই 'বিধবা ঘুঘ্‌নি'-ওয়ালার উদ্দেশে। তাতেও বুড়ির গা ঘিন্‌ ঘিন্‌ থামে না। শেষে ছোট নাতনীটাকে সঙ্গে নিয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে চল্‌লো আহিরীটোলার ঘাটের দিকে—গঙ্গায় তিনটে ডুব দিয়ে আসবার জন্যে। এক পাতা 'বিধবা ঘুঘ্‌নি' খেয়ে বিন্দেঠাকরুণের জাত-ধর্ম্ম একেবারে যাবো-যাবো হয়ে উঠেছিল আর কি!

বুড়ো শ্রীকান্ত মাইতি বড় কালো হাঁড়িটা মাথায় বিড়ের ওপর বসিয়ে পাড়ায় ঢুকতো—ঠিক রাত আটটার সময় গরম কালে। কুল্‌পি বরফ বেচতো শ্রীকান্ত মাইতি। এই ল্যাম্পপোস্টটার তলায় হাঁড়িটা নামাতো। হাঁড়ির মধ্যে হাত গলিয়ে গলিয়ে বরফ চাপা দিত টিনের কুল্‌পিগুলোর ওপর। বেশ খড়্‌-মড়্‌ ক'রে আওয়াজ উঠতো তাতে। ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা আওয়াজ। শ্রীকান্ত মাইতির দেশ ছিল শান্তিপুরে। গরম কালটা সে কলকাতায় কাটাতো কুল্‌পি বরফ বেচে। থাকতো মানিকতলায় খালপারে। বর্ষা

নাম্‌লেই আর শ্রীকান্ত থাক্‌তো না কলকাতায়। চলে যেত দেশে চাষ আবাদ করতে।

নিতাই মজুমদারের সঙ্গে তার আলাপ ছিল আগে থেকেই। নিতাইয়ের দোকানে এসে অনেকক্ষণ বসতো—গল্প করতো। নিতাইকে মাঝে মাঝে কুল্‌পি বরফ খাওয়াতো। কেমন বরাত ছিল ভালো শ্রীকান্তর। দু'ঘণ্টার বেশি তাকে আর মাথায় হাঁড়ি নিয়ে ঘুরতে হ'তো না। সব কুল্‌পি তার বিক্রি হয়ে যেত ঐ দু'ঘণ্টার মধ্যেই। দৈনিক যা রোজগার হ'তো, শ্রীকান্ত তা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত না তার বাসায়—সেই মানিকতলার খালপারের বস্তিতে। সেখানে বড় চোরের উপদ্রব। শ্রীকান্ত তাই সমস্ত রেখে যেত নিতাই মজুমদারের কাছে। তার হিসেব লিখে রাখতো নিতাই। বাঙ্‌লা হিসেব সে বেশ ভালো ভাবেই লিখতে জানতো।

এক একদিন বলতো নিতাই, ওরে ছিরিকান্ত, তোর টাকা পয়সা তুই নিয়ে যা, বাপু। তোর গচ্ছিত ধন রেখে আমার রাতে ঘুম হয় না। কি জানি কখন মরে-ফরে যাবো হঠাৎ, তখন তোর সমস্ত টাকা পয়সা একেবারে পরের হাতে চলে যাবে। এক পয়সাও তুই আর পাবি না।

শ্রীকান্ত বলতো, নিতাইদা, তুমি হঠাৎ ম'রে গেলে—টাকা পয়সার শোকের চেয়ে তোমায় হারাণোর শোকটা বেশি লাগবে আমার—তা জেনো। টাকাকড়ি সব তোমার কাছেই থাকবে—ও আর আমি বাসায় নিয়ে যাবো না।

এমনি ছিল পরস্পরের হৃদ্যতা।

শান্তিপুরে শ্রীকান্তর কিছু জমিজেরাত আছে—চাষ আবাদ হয় —কতক ভাগে আর কতক খাসে। দেশের বাড়িতে ছেলে আছে— ছেলের বৌ আছে—আছে অনেকগুলি নাতিনাত্‌নী। নাই কেবল

শ্রীকান্তর নিজের স্ত্রী। মারা গেছে আজ অনেক বছর। দেশে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব কিছু নেই। তবু শ্রীকান্ত প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের আগেই কলকাতায় চলে আসবে। উঠবে গিয়ে মানিকতলার খালপারের বস্তিতে। ঠিকে বাসা বাঁধবে ক'মাসের জন্য সেখানে। হাঁড়ি কিনবে, বরফ কিনবে, কিন্‌বে এক বস্তা নুন; তারপর কিনবে দুধ আর চিনি—মাঝে মাঝে সিদ্ধিও। কুল্‌পি বরফ বানাবে। বেচবে মাথায় ক'রে বয়ে সন্ধ্যার পর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। বেশ লোক ছিল শ্রীকান্ত।

একদিন হ'লো কি—বরফ বেচে রাতে ফিরলো নিতাইয়ের দোকানে গায়ে জ্বর নিয়ে। সেদিন সকাল থেকেই শরীরটা কেমন খারাপ যাচ্ছিল শ্রীকান্তর। বুঝতে পারেনি তেমন, যখন সন্ধ্যার পর বেরিয়েছিল কুল্‌পি বেচতে। এসেই বললে, দাদা, আর পারছি নি হাঁটতে—কেমন করছে শরীরটা।

নিতাই তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেই বলে উঠলো, এ কি ছিরিকান্ত—জ্বরের উত্তাপে তোর গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। ধান ছড়ালে যে খই হয়ে যাবে রে! শুয়ে পড়্—শুয়ে পড়্ এইখানে—আর এত রাতে বাসায় ফিরে কাজ নেই।

শ্রীকান্ত শয্যা নিলে নিতাইয়ের দোকানে কুল্‌পির হাঁড়িটা এক কোণে ঠেলে রেখে। কোমর থেকে টাকা পয়সার গেঁজেটা খুলে নিতাইয়ের কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। নিতাই সেটা তুলে রাখলে বাক্সর মধ্যে। তারপর দুই বুড়ো রাত কাটালে ভালো। এক বুড়ো সেবা করে—সেবা নেয় আর এক বুড়ো।

পরের দিন জ্বরের মাত্রা আরও বাড়লো। শ্রীকান্ত একেবারে বেহুঁস্। জিজ্ঞেস করলে কোন কথার উত্তর দেয় না। প'ড়ে থাকে চুপ ক'রে।

নিতাই বললে, শান্তিপুরে তোর ছেলেদের চিঠি লিখে দিই একখানা—কি বলিস্, ছিরিকান্ত।

শ্রীকান্ত বললে, না দাদা। আমি ঠেলে উঠবো ঠিক। কারোয় এখন জানাতে হবে না।

শ্রীকান্তর একজ্বরী অবস্থা। নিতাই আর বিলম্ব করলে না। একজন ডাক্তার এনে দেখালে শ্রীকান্তকে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর একটি মেয়েমানুষ এসে দাঁড়ালো এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে। গায়ের রঙ্ একেবারে মিশমিশে কালো। পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মাথার সিঁথিতে সিঁদূর আছে—বয়স হবে প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। চোখের দৃষ্টি বড় খর।

একটু দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে মেয়েমানুষটি নিতাইয়ের দোকানে পা-পা ক'রে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে নিতাইকে, হ্যাগা —এখানে নিতাই বোষ্টমের মুড়ি মুড়কি বাতাসার দোকান কোন্‌টা ?

নিতাই জিজ্ঞেস করলে, কেন বাছা—কি চাই তোমার ?

—দরকার আছে। নিতাই বোষ্টমের দোকানটা দেখিয়ে দাও না, বাপু।

নিতাইকে আর দোকান দেখিয়ে দিতে হ'লো না। ঘরের এক কোণ থেকে শ্রীকান্ত কাঁথা চাপা দিয়ে শুয়ে শুয়ে অমনি ব'লে উঠলো, কে—তুলসী নাকি!

মেয়েছেলেটি চমকে উঠে গালে হাত দিয়ে একেবারে চোখ কপালে তুলে ব'লে উঠলো, ও মাগো—কেমন তর মিন্‌সে গো তুমি ? আজ দু'দিন আমি এই অবলা মনিষ্যি একা সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছি গরু খোঁজার মত ক'রে। বলি—মানুষটা গেল কোথায় ? আজ তিন দিন দেখা নেই খোঁজ নেই খবর নেই কিছু—কুল্‌পি বরফ বেচতে

বেরিয়ে নিজে কি শেষে বরফে জমে গেল নাকি! কি আক্কেলখানা তোমার বল' দেখি!

উত্তরে শ্রীকান্ত বললে, তুলসী, আজ ক'দিন খুব জ্বর ভোগ হচ্ছে রে। দাদা ছিল তাই এতক্ষণ পর্য্যন্ত রক্ষে পেয়ে আছি। নইলে বোধ হয় রাস্তার ওপরই মাথা ঘুরে প'ড়ে মরে যেতুম। আয় তুলসী, ঘরের ভেতরে আয়।

তুলসী ঘরের ভেতর গেল। শ্রীকান্তর গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখলে, সত্যিই তো জ্বরভোগ বেশ হচ্ছে। তারপর তুলসী জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা জানলে।

নিতাই পূর্ব্বে কখন' তুলসীকে দেখে নি। শ্রীকান্তর সঙ্গে তুলসীর সম্পর্কটা কি, তাও জানতো না। কেই বা জানবে! ঐ ল্যাম্প-পোস্টটা কি তা' জানতো? সেইদিনই তুলসীকে প্রথম দেখলে সে। জানলে সব তারপরে।

মানিকতলার খালপারের বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়েছিল তুলসী। তুলসী ওখানে বারো মাসই থাকে। শ্রীকান্ত মাইতি যে ক' মাস কলকাতায় ব্যবসা করতে আসতো—সে ক' মাস সে তুলসীর ঘরেই থাকতো। শ্রীকান্ত টাকা দিত তুলসীকে, বস্তির মালিককে নয়। তুলসীর সঙ্গে শ্রীকান্তর এই বন্দোবস্ত ছিল যে, সন্ধ্যার পর থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত তুলসী তার ঘরে বাবু বসাতে পারবে—কিন্তু রাত দশটার পর আর পারবে না। তখন শ্রীকান্তর অধিকার চলবে। একেবারে তখন যেন ঠিক স্বামীস্ত্রীর রাজত্ব—রান্না খাওয়া শো'য়া বসা সব। সর্ত্তটা তুলসী বরাবর মেনেই আস্‌ছে। শ্রীকান্তও ঠিক রাত দশটার পূর্ব্বে কখনও বাসায় ফিরতো না। এক একদিন এমন হয়েছে—দশটার পূর্ব্বেই শ্রীকান্ত ফিরেছে। এসেই দেখে—তুলসীর ঘরে মানুষ রয়েছে। শ্রীকান্ত আর ডাকাডাকি করত' না। একটা

বিড়ি ধরিয়ে টান্‌তে টান্‌তে সে চলে যেত খালধারটায়। বরফের হাঁড়িটা রেখে যেত ঘরের বাইরে এক কোণে। তারপর একটু ঘুরে ফিরে শ্রীকান্ত বাসায় ফিরতো ঠিক দশটার পর। তখন এসে দেখতো, তুলসীর ঘর খোলা। অন্য পুরুষ কেউ আর নেই ঘরের মধ্যে। তুলসী মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে একটা ভাঙা কাঠের ফ্রেমে আঁটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। শ্রীকান্তকে দেখেই জিজ্ঞেস করতো, কি গো, আজ কি বেশি হাঁটতে হয়েছিল না কি!

শ্রীকান্ত বলতো, না, তুলসী।

—ব'সে জিরোও একটু—তার পর হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি ভাত বাড়ছি।

বিপত্নীক জীবনে নারীর হাতে সেবা পাবার ব্যবস্থাটুকু এমনি ভাবে ঠিক ক'রে নিয়েছিল শ্রীকান্ত। তুলসী তাকে সেবা-যত্ন করতো বেশ। একবার বলেছিল শ্রীকান্তকে, বরাবর এইখানেই থেকে যাও না! শান্তিপুরে যাবার কি দরকার আছে? আমার কাছে কি শান্তি পাচ্ছ না?

শ্রীকান্ত বলেছিল, তা হয় না, তুলসী। সেখানে ছেলেমেয়েরা রয়েছে—নাতি নাত্‌নীরা আছে—তারা জানলে শুনলে বল্‌বে কি?

—তা বেশ, বাপু। যদ্দিন ইচ্ছে—তদ্দিনই তুমি থাকো। আমি যদ্দিন পারি তোমার সেবা করে যাই।

তুলসীর কথা শুনে শ্রীকান্ত মুচকে একটু হেসেছিল।

নিতাইয়ের নাম শুনেছে তুলসী শ্রীকান্তর মুখে। নিতাইয়ের মুড়ি মুড়কি বাতাসার দোকান আছে—কোথায় কোন্‌খানে, তার হদিস্‌ তুলসী জেনে রেখেছিল শ্রীকান্তর কাছ থেকে। নিতাই শ্রীকান্তর এক রকম দেশের লোক—বোষ্টম মানুষ—এ কথাও শ্রীকান্ত বলেছিল.

তুলসীকে। আরও বলেছিল—ফেরবার সময় নিতাইয়ের দোকানে ব'সে শ্রীকান্ত খানিক গল্পগুজব ক'রে আসে রোজ।

শ্রীকান্ত ক'মাস কলকাতায় বেশ আরামে কাটিয়ে যায় তুলসীর কাছে থেকে। ফাল্গুন মাসের শেষেই শ্রীকান্ত কলকাতায় এসে হাজির হ'তো। তুলসীর দিনক্ষণ একেবারে জানা থাক্‌তো। শ্রীকান্ত চিঠি দিয়ে জানাতো না। তুলসী বরাবর শ্রীকান্তর জন্যে ফাল্গুনের শেষ থেকেই তার ঘর রাতে খালিই রাখতো—নিজেও খালি থাকতো। একবার হয়েছিল বেশ—চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হ'য়ে গেল—তবু শ্রীকান্ত কলকাতায় এল না। তুলসী ভাবলে, তাহলে বোধ হয় শ্রীকান্ত ম'রে গেছে—আর আসবে না কুলপি বরফ বেচতে কলকাতায়। রাতের খদ্দের তার ঠিক হলো একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার। ভোর হলেই সে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরে আসে—দুটো খেয়ে একটু বিশ্রাম করে। তারপর গাড়ী নিয়ে আবার ছোটে—ফেরে কোনদিন রাত এগারোটায়, কোনদিন বা রাত বারোটায়। ফেরবার সময় সে মদ খেয়েই ফেরে—সঙ্গে নিয়ে আসে আর এক বোতল, রাতে তুলসীর সঙ্গে একত্রে আবার খাবে ব'লে। দিন দশ বারো কাটলো—এমন সময় একদিন সকালে শ্রীকান্ত এসে হাজির হ'লো তুলসীর ঘরে। তুলসী অবাক্‌ হ'য়ে গেল—ভয় পেল। মনে মনে যাকে মৃত ব'লে ধরে রেখেছে, তাকে জীবন্ত দেখতে পেলে ভয় পাবারই তো কথা। ফাল্গুন মাসে শ্রীকান্তর অসুখ হয়েছিল—তাই আসতে পারে নি। বললে তুলসীকে। তুলসী আশ্রয় দিলে। শ্রীকান্ত তুলসীর পুরানো খদ্দের—তার একটা জোর-আব্দার আছে বই কি। তারপর ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সরিয়ে দিলে বস্তির আর একটি ঘরে মেয়ের কাছে—তুলসীর সম-ব্যবসায়িনী সে।

যাক্—তুলসী মেয়ে ভালো। শ্রীকান্তকে যত্ন-আত্তি করত' বেশ। তবে ঐ—ব্যবসা করতে নেমে যেদিকে নজর রাখা সর্ব্বদাই দরকার, তুলসীর নজর সেদিকে বড়ই প্রখর থাক্তো। শ্রীকান্তর টাকা পয়সার গেঁজেটা সে প্রায়ই নাড়তো চাড়তো লুকিয়ে লুকিয়ে। শ্রীকান্তও পাকা ব্যবসায়ী। তারও নজর ছিল ওদিকটায় খুবই—সতর্ক থাকতো বেশ। অনেক ভেবে চিন্তে শ্রীকান্ত মোটা টাকার তহবিলটা আর তুলসীর ঘরে রাখতো না। সেটা রাখতো সে বরাবর নিতাই মজুমদারের দোকানে। বোষ্টম মানুষ নিতাই—ঘোর-প্যাঁচ ছিল না মনে। গৌরপ্রেমের গণ্ডি দিয়ে শ্রীকান্তর তহবিল তুলে রাখতো সে তার বাক্সর মধ্যে। জমা খরচের হিসাব লিখে রাখতো নিতাই শ্রীকান্তর কারবারের। তারপর বর্ষা সুরু হ'লে শ্রীকান্ত যখন শান্তিপুরে চলে যেত'—নিতাই তার হাতে তুলে দিত তার তহবিল। যার গচ্ছিত ধন তাকেই দিত ফিরিয়ে একেবারে পাই পয়সাটি পর্য্যন্ত হিসেব মিলিয়ে। শ্রীকান্ত আর গুণেই দেখত না তার তহবিলের অঙ্কটা। এমনি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ছিল তার নিতাই বোষ্টমের ওপর।

তুলসীর পাওনাগণ্ডা শ্রীকান্ত মারতো না। মাস মাস দিয়ে যেত ঠিক কথামত। উপরন্তু যাবার সময় একেবারে থোক্ ত্রিশটা টাকা তুলসীর হাতে গুণে গুণে দিত শ্রীকান্ত—তার এককালীন ভালো-বাসার দানস্বরূপ। তুলসীর কালো রঙের গাল দুটো তখন ফুলে উঠতো আনন্দে। একটু যেন লালচে আভা দিত তাতে। গলায় আঁচল দিয়ে শ্রীকান্তর পায়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিজের মাথায় জিবে বুকে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলতো তুলসী শ্রীকান্তর হাত দু'খানা ধরে, এস' এবার। আবার আসবে তো ফাল্গুনে? আমি দিন গুণে বসে থাক্বো কিন্তু।

শ্রীকান্ত বলতো, আসবো বই কি, তুলসী। বেঁচে থাকি তো নিশ্চয় আসবো—তোর ঘর ছাড়া, তুলসী, আর কোথাও যাবো না।

তুলসী বলতো মুখখানা ভারি ক'রে, বালাই ষাট্—বাঁচবে না কেন গা—কি এমন তোমার বয়স হয়েছে!

এ হেন তুলসী শ্রীকান্তকে দুদিন ফিরতে না দেখে খোঁজে বেরিয়েছিল তার। জানতো সে নিতাই বোষ্টমের দোকানে তার আড্ডা। পাড়ার নাম তার জানা ছিল। এসে দাঁড়ালো ল্যাম্পপোস্টটার কাছে খোঁজ নিতে নিতে। তারপর সন্ধান পেয়ে গেল শ্রীকান্তর—তার পুরানো খদ্দেরের।

সমস্ত শুনে তুলসী বললে, তা বেশ করেছ। এ অবস্থায় দা'ঠাকুরের আচ্ছয়ে আছো—খুব ভালোই।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে এসে তুলসী নিতাইয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে, দা' ঠাকুর—আমি আপনার নাম শুনিছি অনেকবার মাইতি মশা'য়ের মুখে। বিপদে আপদে দেশের নোক যদি না দেখবে—দা' ঠাকুর, একটু কিরপা করতে হবে যে। ছিরিচরণ দুটো একটু বাড়িয়ে ধরুন দয়া ক'রে—পেন্নাম করবো।

নিতাই তখনও বুঝতে পারে নি ওদের সম্পর্কটা। কেমন বিনয়ে জড়সড় হয়ে গেল। কিন্তু বোধ করতে লাগলো। ভরসা ক'রে জিজ্ঞেসও করতে পারে না কিছু। একেবারে যেন কাঁচুমাঁচু অবস্থা।

তুলসী ছাড়লে না। এগিয়ে গেল আরও একটু। তারপর ভক্তি ভরে প্রণাম করলে নিতাইকে। নিতাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় জিবে বুকে ঠেকিয়ে তুলসী স্পষ্টই জিজ্ঞেস করলে নিতাইকে, মাইতি মশাই টাকা পয়সার গেঁজেটা কোথায় রেখেছে? আছে তো কাছে—না—জ্বরের ঘোরে পথে কোথাও ফেলে এলো!

এ কথার জবাব নিতাই দিলে না। দিলে শ্রীকান্ত। বললে, সেদিন আর ঘুরতে পারি নি, তুলসী। কুল্‌পি সব ফেলাই গেছে। গেঁজের মধ্যে যা' ছিল—তা' সব ডাক্তারে ওষুধে খরচ হ'য়ে গেছে। উল্টে দাদার কাছে এখন ধার চল্‌ছে।

তুলসী বললে, মাইতি মশাই, ও কথা তুমি মোটেই ভেব' না। দা'ঠাকুর ভক্ত মানুষ—হিয়ে আছে। ও টাকা কি উনি ধার ব'লে দিচ্ছেন? তুমি দেশের নোক। তোমার সেবায় উনি দান করছেন। ধারের কথা বল্‌লে, ওঁকে অবমাননি করা হয়। তা বেশ—তুমি এখানে থেকে আগে সেরে ওঠ—তারপর যেও'খন ওখানে।

এই ব'লে তুলসী এসে বসলো আবার শ্রীকান্তর মাথার কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এতদিনের পুরানো খদ্দের—অসুখে পড়েছে—একটু সেবা তুলসী তাকে করবে বই কি!

আর একটু ব'সে তুলসী উঠে দাঁড়ালো। একটা সখেদে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে নিতাইকে, কি চিন্তেই না আমার হয়েছিল! দু'দিন খোঁজ খবর কিছু না পেয়ে রাতে ঘুমুতে পারি না—মুখে কিছু যায় না। কেবল ভাবি—কেবল ভাবি। রাস্তায় গাড়ী ঘোঁড়া—কোনো বিপদ্‌ আপদ ঘটলো না কি! একা আমি অবলা মনিষ্যি—কোথায় খোঁজ করি বলুন, দা'ঠাকুর। আজ আর কিন্তু থাকতে পারলুম না। সন্ধ্যের পর বুকের ভেতরটা কেমন হাঁচড়-পাঁচড় করতে লাগ্‌লো। ভাবলুম—যাই একবার খোঁজ ক'রে ক'রে দা'ঠাকুরের দোকানে, যদি সেখানে কোন সন্ধান পাই। আরি এ তো আমার জানা পথ। একাদশী আমাবস্যে পুন্নিমাতে তো গঙ্গাচান করতে যাই ঐ পথ ধ'রে। ঐ মোড় থেকে একটু বেঁকে আসা বই তো নয়! তা দা'ঠাকুর বলবো কি—এখানে এসে সব দেখে শুনে গেলুম—বুক থেকে যেন একটা পাথর সরে গেল—হাল্কা হ'লো অনেকটা।

তারপর শ্রীকান্তর দিকে চেয়ে বললে তুলসী, মাইতি মশাই, ভয়-ভাবনা কিছু করুনি। আমি আবার আসব'খন দেখতে। আর যদি দরকার পড়ে, খবর দেবে—আমি চলে আসবো তখুনি এখানে। তোমার সেবা-যত্নের ত্রুটি হবে না কিছু, আমি বেঁচে থাক্‌তে—এ কথা ব'লে রাখছি। আমি কুলিন বামুনের মেয়ে—যা' বলি তাই করি—তা' জানবে।

নিতাই একেবারে থ' মেরে গেছে। একটা ছোট টুলের ওপর ব'সে ছিল। শুন্‌ছিল তুলসীর কথাগুলো—দেখছিল তুলসীর হাব-ভাব।

তুলসী এবার মুখ ঘোরালে নিতাইয়ের দিকে। বললে, দা'ঠাকুর, একটা কথা বলি। আপনাদের কাছে বলবো না তো আর কার কাছে ব'লবো বলুন! হাতে কিছু নেই যে, কাল বাজার আনাই। মাইতি মশাই তো এখন এখানে প'ড়ে রইলেন। আমায় দুটো টাকা দিন্। পরে মাইতি মশাই এ টাকা আপনাকে শোধ ক'রে দেবে'খন।

তুলসী আরও যেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর তা'কে বলতে হ'লো না। শ্রীকান্ত শুয়ে শুয়ে বললে, দাদা, তুলসীর হাতে দু'টো টাকা দিয়ে দাও।

নিতাই বাক্স খুলে দু'টো টাকা বার ক'রে তুলসীর হাতে দিলে। তুলসী টাকা দু'টো শক্ত ক'রে আঁচলে বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে দোকানের এদিক ওদিক দেখতে লাগলো খরদৃষ্টি হেনে হেনে। তারপর একটু মুচকি হেসে বললে নিতাইকে, দা'ঠাকুরের দোকানখানি বেশ। কিছু মসলা-মাখানো মুড়কি দাও না গো! বেশ গন্ধ বেরুচ্ছে। আজ আর এত রাতে গিয়ে রান্নাবান্না করতে ইচ্ছে যাচ্ছে না। ঐ মুড়কি দু'টি খেয়েই রাতটা কাটাবো মনে করছি, দা'ঠাকুর। আর

টাট্‌কা বাতাসা বানিয়েছ দেখছি—তাই পোয়াটাক দিও। ঘর করতে কখন দরকারে লাগে—

শ্রীকান্ত বিরক্তি প্রকাশ করছিল মুখে। নিতাই মনখোলা লোক। না চাইতেই সে দেয়—চাইলে সে কি আর না দেবে! দিলে নিতাই তুলসীকে মসলা-মাখানো মুড়কি ও টাটকা বাতাসা কাগজের ঠোঙায় পুরে পুরে। তা ছাড়া অন্য দুটো ঠোঙায় কিছু বেশি ক'রে মুড়িও দিলে—চিঁড়েও দিলে। সব গুছিয়ে আঁচলে বেঁধে নিয়ে তুলসী নিতাইকে আবার একটা প্রণাম ঠুকে বিদায় নিলে। মনটা তুলসীর বেশ খুশিতে ভ'রে উঠেছে। কালোমুখে হাসি যেন উছলে পড়ছে। শ্রীকান্তর কাছে গিয়ে ব'লে এলো, আসি এখন মাইতি মশাই—আবার আসব'খন।

রাত তখন ন'টা বেজে গেছে। নিতাইয়ের দোকান থেকে নেমে তুলসী এসে দাঁড়ালো এই ল্যাম্পপোস্টটার পাশে। মুড়কির ঠোঙাটা আরও ভালো ক'রে বেঁধে নিলে আঁচলে ল্যাম্পপোস্টের আলোতে। খর চাহনিতে একবার এদিক ওদিক দেখলে তুলসী। তারপর ধীরে ধীরে নাম্‌লো রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টটা ধ'রে। ল্যাম্প-পোস্টটার গা-টা শিউরে উঠেছিল তাতে ভয়ে ও ঘৃণায়—কালো সাপের অঙ্গপরশে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনি ভাবে। তুলসীকে মনে আছে ল্যাম্পপোস্টটার আজও--মোটেই ভোলে নি তা'কে।

শ্রীকান্ত মাইতি ওস্তাদ লোক। সাপ খেলাতে সে জানতো। তাই প্রতি বৎসর কলকাতায় এসে তুলসীর ঘরে ক'মাস থেকে নিজে খেলে ও তা'কে খেলিয়ে বেশ হাসতে হাসতেই শান্তিপুরে দেশে ফিরে যেত। সাপের দংশন তাকে কখন' খেতে হয় নি—এমনি মন্ত্রগুণ জানা ছিল তার। শ্রীকান্ত রইলো প্রায় পনের দিন নিতাইয়ের দোকানে। জ্বর কিন্তু তার আর ছাড়লো না। তুলসী আরও

তিনবার এসেছিল তার মাইতি মশাইকে দেখতে। আর ফেরবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতো দু'টি ক'রে টাকা আর কিছু বাতাসা ও মসলা-মাখানো মুড়কি।

নিতাই পরে বুঝতে পেরেছিল শ্রীকান্ত ও তুলসীর সম্পর্কটা। কিছু অপ্রিয় কারোয় বলে নি। কৃষ্ণের জীব—যে যা'তে আনন্দ পায় পাক্—তাতে তার বলবারই বা কি আছে। শ্রীকান্তর করলে-কম্মালে খুব নিতাই। ঠিক আপন ভা'য়ের মত তার সেবা ক'রে গেল যথা সময়ে ওষুধ পথ্য নিজ হাতে দিয়ে দিয়ে।

মধ্যে একদিন তুলসী তার মাইতি মশাইকে দেখতে এসে হঠাৎ মনপ্রাণ ঢেলে দিলে নিতাই বোষ্টমের সেবায়। হাতে তার গামছা এগিয়ে দেয়—চা তৈরি ক'রে দেয়—গরম দুধে খই ফেলে ভিজিয়ে রাখে। নিতাই কলতলা থেকে ফিরে এলে, তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল দিয়ে নিতাইয়ের পায়ের জল মুছিয়ে দিতে ছুটে যায়। নিতাই অমনি হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠে। 'গৌর—গৌর' ব'লে লাফিয়ে পিছিয়ে আসে পাঁচ হাত।

অভিমানের সুরে অমনি তুলসী ব'লে ওঠে, হোক না দা'ঠাকুর—এতে দোষ কি! যখন এসেছি, তোমার সেবা ক'রে একটু পুণ্যি অর্জ্জন করি না!

নিতাই আমল দেয় না। 'তা হয় না' ব'লে ঘরের অন্যদিকে স'রে যায়।

আর একদিন তুলসী বলেছিল শ্রীকান্তর জ্বর বাড়ছে দেখে, দা'ঠাকুর, আজ রাতে আমি এখানে থাক্‌বো, নইলে তুমি একা বুড়ো মানুষ—এই রুগী নিয়ে সাম্‌লাবে কি ক'রে?

নিতাই অমনি বলেছিল, আমি কি সামলাচ্ছি—সামলাচ্ছেন গোরাচাঁদ। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—তুমি ঘর যাও।

উপায় আর কিছু না পেয়ে তুলসীকে ঘরে ফিরে আসতেই হয়েছিল আঁচল ভ'রে ছাঁদা বেঁধে।

হঠাৎ কি মনে ক'রে শ্রীকান্ত দেশে ফিরে যাইতে চাইলে। নিতাই তার বড় ছেলেকে চিঠি লিখে দিলে একখানা, তার দোকানের ঠিকানা দিয়ে। পত্র পেতেই ছেলে এসে নিয়ে গেল তার বাপকে।

তারপর থেকেই শ্রীকান্তর আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। বছর ঘুরলো—শীতের পর গরম এলো আবার। কিন্তু শ্রীকান্ত আর এলো না নিতাইয়ের দোকানে। কি হ'লো—কে জানে! কুল্‌পি বরফের হাঁড়িটা আর কতকগুলো টিনের কৌটো প'ড়ে রইলো নিতাইয়ের দোকানে কিছুদিন ধ'রে। তারপর সব-সমেত হাঁড়িটা নিতাই একদিন দোকান থেকে বার ক'রে এই ল্যাম্পপোস্টটার গোড়ায় ফেলে দিলে। কালো হাঁড়িটা—ঠিক তুলসীর মুখের মত। পরক্ষণেই একজন ভিখিরী ছুটে এসে হাঁড়িটা তুলে নিয়ে চলে গেল। ব্যাস্—অমনি মুছে গেল শ্রীকান্ত মাইতির স্মৃতিচিহ্ন এখান থেকে।

পরে একদিন তুলসী এসেছিল খোঁজ নিতে তার মাইতি মশা'য়ের। গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছিল একাদশী তিথিতে। কপালে শ্বেত চন্দন থাবড়ে নিয়েছে খানিকটা। সেটা বেশ সাদা রঙ্ নিয়ে ফুটে উঠেছে যেন কালো পটের ওপর। হাতে ঝুলছিল তুলসীর একটা ছোট তামার কমণ্ডলু। এসে জিজ্ঞেস করলে নিতাইকে, দা'ঠাকুর, মাইতি মশা'য়ের কোন খবর পেয়েছ কি ?

নিতাই বললে, না।

তুলসী ব'লে গেল, আচ্ছা মনিষ্যি যা হোক্। একটা কথা ব'লে গেল না কিছু! সেই থেকে ত্ব'মাসের ঘর-ভাড়া আমার বাকি প'ড়ে রয়েছে। এখনও—আমি অবলা মেয়েছেলে শোধ করতে তা কিছুতেই পারছি না।

নিতাই হেসে বললে, নিজের দেনা সবাই কি আর নিজে শোধ ক'রে যেতে পারে এ সংসারে? অপরের দেনাও মাঝে মাঝে শোধ করতে হয় মানুষকে।

তুলসী আর সুবিধে করতে পারলে না। চেষ্টা করেছিল নিতাই বোষ্টমকে শ্রীকান্ত মাইতির মত তার আঁচলে বাঁধতে। কিন্তু নিতাই ধরা দিলে না—একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সে। আর কিছু বললে না তুলসী। চাইলেও না সেদিন, কি জানি কেন, পোয়াটাক বাতাসাও। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে এই ল্যাম্পপোস্টটা ধ'রে রাস্তায় নামলো তুলসী। তারপর চলে গেল মানিকতলার খালপারের বস্তির দিকে। আর কোনওদিন এদিকে দেখা যায় নি তাকে।

•

পর বৎসর বর্ষা নামলো একেবারে ঘনঘোর ঘটায়। সে কী বর্ষা—কী বর্ষা! যেমন জল—তেমনি ঝড়। দু'দিন দু'রাত প্রায় সমানে চলেছিল। অর্দ্ধেক কলকাতা শহর ডুবে ছিল জলে। ল্যাম্পপোস্টটার তলার খানিকটা দেখা যেত না। রাস্তার জল থৈ-থৈ করছিল তার তলায়। আলো জ্বলে নি দু'দিন। মই ঘাড়ে ক'রে গ্যাস-কোম্পানীর লোক আসতে পারে নি জল ভেঙে ভেঙে। ছেলেরা কোত্থেকে পানসী নৌকো এনে ভাসিয়েছিল শহরের পথে। তাদের জলকেলির হৈ-হৈ উঠেছিল খুব। রাত আটটার আগে থেকেই প্রচণ্ড ঝড় আরম্ভ হলো। তারপর নামলো বর্ষণ। গোঁ-গোঁ ক'রে দমকা বইতে লাগলো ভিজে হাওয়া। বাড়ির দরজা জানলা উঠতে লাগলো কেঁপে কেঁপে। হুড়্মুড়্ ক'রে ভেঙে প'ড়লো সেই রাতে

সতের নম্বর বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুরানো দেয়ালটার অনেকখানি। খুব গুরুবল—কেউ হতাহত হয় নি তাতে। নিতাই বোষ্টমের দোকানের টিনের চালখানা গেল উড়ে। দোকানের ভেতর জল ঢুকেছে অনেক আগেই। রাত দু'টোর সময় ভেঙে পড়লো দোকান-ঘরখানা। সে ভেঙে-পড়াটা কেউ দেখেনি পাড়ায়। দেখেছে কেবল ল্যাম্পপোস্টটা। অমন দুর্য্যোগে যে যার নিজের সামলাচ্ছে। সামলাচ্ছে নিজের ঘর-দোর—ছেলে মেয়ে পরিবার। অপরকে সামলাবার অবসর কোথায়—সাহস কোথায়!

পরের দিন সকালে সকলে দেখলে রাস্তায় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে। ল্যাম্পপোস্টটার খানিকটা ডুবে আছে জলে। বর্ষণটা একটু থেমেছে বটে—কিন্তু থামে নি মেঘের গর্জ্জন। গুড়্‌গুড়্‌ ক'রে তখনও ডাক্‌ছে। কি হ'লো—নিতাইকে তো দেখা যাচ্ছে না! দোকানঘর চাপা প'ড়ে মারা গেল না কি? ওরে আয়—আয়—খোঁজ্‌—খোঁজ্‌! বুড়ো নিতাই বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে চাপা প'ড়ে। আহা—বেচারা বুড়ো মানুষ—অপঘাতে অমন ক'রে মারা গেল বুঝি! সরা' সব হাঁড়ি-কুঁড়ি—সরা' সব কলসী-জালা—সরা' কড়া-খুন্তি। বার কর্ টেনে বুড়ো নিতাইকে। ছুটে এলো পাড়ার জোয়ান মরদের দল—ছুটে এলো বুড়োরাও।

ডাকতে লাগলো, নিতাই—নিতাই।

কারোর সাড়া নেই। মুড়ি মুড়কি সব ভাসছে জলে। বক্-বক্ আওয়াজ উঠছে। জল ঢুকছে কলসীর মধ্যে।

—নিতাই—নিতাই—

কোথায় নিতাই!

—নিশ্চয় মারা পড়েছে।

—কে আর রক্ষে করবে বলো! কি দুর্য্যোগ-রাতটা গেল!

এমনি ক'রে পাড়ার লোকেরা নিতাইয়ের দোকানখানা একেবারে তন্ন তন্ন ক'রে উল্টে ফেললে। নিতাইকে পাওয়া গেল না কোথাও! কে জানে—কোথায় গেল নিতাই! কিন্তু অমন দুর্য্যোগে ল্যাম্পপোস্টটা দেখেছিল নিতাইকে। রাত তিনটের সময় জপের মালাটা হাতে নিয়ে নিতাই বেরিয়ে এলো দোকান থেকে। এক হাঁটু জল ভেঙে এসে দাঁড়ালো ল্যাম্পপোস্টটার পাশে। কেউ কোথাও নেই রাস্তায়—একেবারে যেন প্রলয় সমুদ্দুর চারিধারে! নিতাই ফিরেও তাকালে না ভেঙে-পড়া জলমগ্ন দোকানটার দিকে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি—হাসিটি কি প্রশান্ত! মায়ার ফাঁস সংসারের বাঁধন জোর ক'রে খসাতে গেলে বুক থেকে গুমরে ওঠে একটা চাপা কান্নার ঢেউ। কিন্তু সে-ফাঁস সে-বাঁধন যখন আপনি খসে পড়ে—তখন মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আসে অনেকদিনের রুদ্ধ প্রাণখোলা হাসির লহর। কিসের যেন কপাট যায় খুলে—ছড়িয়ে পড়ে সেখান থেকে একটা স্নিগ্ধ আলোর উচ্ছ্বাস। ধরণীর ক্লেদ-কালিমায় রঞ্জিত করতে পারে না সে-আলোর দ্যুতি। চলার পথে তখন সুমুখটাই উজ্জ্বল ভাস্বর হ'য়ে ওঠে—পেছনটা থেকে যায় যেন একেবারে ঘন অন্ধকারে অবলুপ্ত। সেই পথ ধ'রেই নিতাই মজুমদার গেল চলে। এই ল্যাম্পপোস্টটা থেকেই তার সম্মুখযাত্রা হ'লো সুরু। দোকানখানা প'ড়ে রইলো তার হাঁড়ি কুঁড়ি জালা কলসী নিয়ে—ঠিক যেন বাসি ফুলের মালার মত। চলে গেল নিতাই বোষ্টম প্রেমিকা অভিসারিকার ন্যায় তার প্রেমাস্পদের মধুকুঞ্জে—কোথায় কতদূরে কার কাছে, জানে না তা' কেউ—জানে না তা' ল্যাম্পপোস্টটা!

তা' না জানুক; কিন্তু জেনেছে—রাতের আঁধারে নিতাইয়ের নিজ হাতে তৈরি প্রসিদ্ধ বাতাসায় ভর্ত্তি কালো কলসীটা সকলের

অজ্ঞাতসারে এটা ওটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে চুপিসারে নিজের ঘরে নিয়ে গেছে বোসবাড়ীর ভবেশ পালিত। নিয়ে যেতে দেখেছে তা'কে। দোষের কি আছে! অমন তো পাড়ার অনেকেই নিয়ে যাচ্ছিল এক একটা ক'রে।

—ওগো বাছা কাজ করবে?

—কিসের কাজ?

—ঝিয়ের কাজ—বাসনমাজা ঝিয়ের কাজ।

—ঠিকে—না—রাত দিনের?

—যা পারবে।

মনে প'ড়ে গেছে ল্যাম্পপোস্টটার যোগীন মুখুয্যের কথা। প্রায় তার পাশে দাঁড়িয়ে বেলা তিনটের সময় যোগীন মুখুয্যে ঝিয়ের সন্ধান করতেন। বেশ মাঝারি বয়স—গতর আছে—খাটতে খুটতে পারবে—এমন ঝি রাস্তায় দেখতে পেলেই যোগীন মুখুয্যে তা'কে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন ঐ রকম ভাবে। বাইস্ নম্বর বাড়িতে থাক্‌তেন যোগীন মুখুয্যে। মুখুয্যে গিন্নী সাতটি ছেলেমেয়ের মা। বাসন মাজা ঠিকে ঝি—কত যে যোগীন মুখুয্যে ঠিক ক'রে রাস্তা থেকে ধ'রে নিয়ে এলেন, তার ঠিক নেই। কিন্তু কোনো ঝি সাত আট দিনের বেশি মুখুয্যে গিন্নীর কাছে টেঁকতে পারতো না। মুখুয্যে গিন্নীর মুখের সামনে দাঁড়ায় কে! যতক্ষণ জেগে থাকেন—খাম্বাজী গলায় ঝগড়ার সুর ততক্ষণ তাঁর বাঁধা। কারোর না কারোর সঙ্গে ঝগড়া তিনি করছেনই। প্রতিদ্বন্দ্বী যখন কারোর

পান্ না, তখন সম্মুখ যুদ্ধে মুখুয্যে মশাইকেই আহ্বান করেন। মুখুয্যে মশাই যখন পারেন না, বিরক্ত হয়ে ওঠেন গিন্নীর গজগজানিতে—তখন তিনি বেরিয়ে আসেন বাড়ি থেকে। সটাং এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে এসে আপন মনে পায়চারি করতে থাকেন। স্বামী-স্ত্রীর বাক্‌বিতণ্ডায় যেখানে স্বামীর গলায় জয়মাল্য পড়ে, সেখানে পরিণাম দাঁড়ায় সাংঘাতিক। সেইটাকে রীতিমত এড়িয়ে চলতেন মুখুয্যে মশাই নিজেই পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়ে। কিন্তু তাতে শান্তি পান না মুখুয্যে গিন্নী। কলহপ্রিয়া নারীর কাছে এ সংসারে নীরব প্রতিপক্ষ একেবারে মৃত্যুতুল্য যন্ত্রণাদায়ক। কলহের সরবতা জাগিয়ে রাখতে সে-সব নারী শেষ পর্য্যন্ত কিছু না করতে পেরে দুম্ দুম্ ক'রে নিজের মাথাটা মেঝের ওপর ঠুকে রক্ত গঙ্গা ছুটিয়ে দেয়। ঠিক এই প্রকৃতি ছিল মুখুয্যে গিন্নীর।

ল্যাম্পপোস্টটা শুনেছে কতবার—যোগীন মুখুয্যে বেশ শক্ত ডাঁটো-গোছের ঝি দেখতে পেলেই, অমনি তাকে এই ল্যাম্প-পোস্টটার কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করতেন, হ্যাঁ গা বাছা—কাজ করতে পারবে ?

—কেন পারবো না ? কিসের কাজ—বাসনমাজার তো !

—সে কথা পরে। প্রথম জিজ্ঞেস্ করি—গলা ছেড়ে তুমি ঝগড়া করতে পারো কি ?

ঝি অমনি ফিক্ ক'রে হেসে ফেলতো। বলতো, এ কি কথা সুধোচ্ছ, দাদাবাবু ? ভদ্দর নোকের বাড়ি কাজ করবো—ঝগড়া করবো কেন ?

নরম গলায় মুখুয্যে মশাই বলতেন, হাঁ গো বাছা—ঠিকই বলছি। দু'টাকা মাসে বেশি নিও নয় তারির জন্যে। গিন্নীর সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—বুঝ্‌লে। পার তো চলো—আজই কাজ বুঝিয়ে দিই।

আত্মরক্ষা করবার জন্যে যোগীন মুখুয্যে শেষে অনেক ভেবে ভেবে এই পথ ঠিক করলেন। ঝি আন্‌তে লাগলেন বেশ কুঁদুলে ধরণের। তাতে অনেকটা রেহাই পেলেন তিনি। ঝটাপটি লেগে যেত মুখুয্যে গিন্নীতে আর নতুন নিয়োগ-করা ঝি'তে। মুখুয্যে মশাই নিশ্চিন্ত আরামে ঘরে চুপ ক'রে বসে থাক্‌তেন। কিংবা কোনো কোনো দিন কাজে বেরিয়ে যেতেন অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে যে, ধকলটা তাঁর ওপর থেকে অন্যের ওপর বর্ত্তেছে। বায়না-ধরা ছোট ছেলের হাতের তেলোয় এক ফোঁটা মিষ্টি গুড় বা একটু চিনি ফেলে দিয়ে তার দুরন্তপনা থামিয়ে মা যেমন ঘর-সংসারের কাজে লিপ্ত থাকে, ঠিক সেইরকম মুখুয্যে মশাই তাঁর গৃহিণীর কলহ-প্রকৃতির কণ্ডূয়নের ব্যবস্থা যথাযথ ঠিক ক'রে রাখতেন মুখরা কুঁদুলে ঝি'কে বাড়িতে এনে। সত্যি—ফল তার হাতে হাতে পাওয়া যেত। নতুন ঝি টিকে থাক্‌তো বেশ কিছু দিন, মুখুয্যে গিন্নীর সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে।

এক এক সময় মুখুয্যে মশাই সাফাই গাইতে গিন্নীকে বলতেন, বাপু, দরকার কি—জবাব দিয়ে দাও না ঝিকে। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই। টাকা দিলে অমন ঢের ঝি পাওয়া যাবে।

দু'হাত সঝঙ্কারে নাড়তে নাড়তে মুখুয্যে গিন্নী বলতেন, কি—জবাব দোব মুখপুড়ীকে! কিছুতেই নয়। ঐ হারামজাদীকেই বাসন মাজতেই হবে।

মুখুয্যে মশাই বুঝতেন, যে গোল সিকিতে ট্যাঁক-দাদ চুলকে আরাম পাওয়া যাচ্ছে—সে সিকিটা কখন' হাত থেকে কেউ ফেলে দেয়! চুল্‌কোও বাপু—প্রাণভোর চুলকোও। মোদ্দা কথা—আমায় রেহাই দাও একটু।

যেদিন খুব এক চোট্ ধস্তাধস্তি হয়ে যায় মুখুয্যে গিন্নীতে আর ঝি'তে, সেদিন্ যোগীন মুখুয্যে একটু আগে থেকেই বেরিয়ে এই

ল্যাম্পপোস্টটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন তাঁর বাড়িতে কলহমগ্না ঝি'য়ের অপেক্ষায়। একটু পরেই দেখতে পেতেন গজ্‌গজ্‌ কর্‌তে কর্‌তে গামছায় হাত মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছে তাঁর বাড়ির ঝি। কাছে এগিয়ে আসতেই অমনি মুখুয্যে মশাই তাকে ডেকে বলতেন, দেখ' বাছা—আমার বাড়ির কাজ যেন ছেড়ে দিও না রাগ ক'রে। তা' হলে আমি মারা প'ড়বো। তোমার কোন ভয় নেই—বুক ঠুকে মুখ ছুটিয়ে কাজে লেগে থাকো। শীতের সময় গিন্নীকে লুকিয়ে তোমায় একখানা গরম গায়ের চাদর দোব'খন।

সে-কথা তখন ঝিয়ের কানে যেত না। চোখ মুখ কান তখন তার লাল হয়ে উঠেছে মুখুয্যে গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে। কিন্তু তা হোক্‌—যোগীন মুখুয্যে কথা রেখেছিল। দিয়েছিল একখানা বোম্বাই চাদর শীতের সময় এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে ঝিয়ের হাতে মুখুয্যে গিন্নীকে লুকিয়ে। ঝি হাসিমুখে সেদিন হাত পেতে নিয়েছিল তা'। বলেছিল, মুখুয্যে মশাই লোক ভালো—গিন্নী যেন কেমনতর!

আজ ক'দিন ধরে ল্যাম্পপোস্টের কথা শুনে যাচ্ছি। শোন্‌বার মতনই কথা। বেশ ভালো লাগছিল শুনতে। অতীত কাহিনীগুলোর মনোরমত্ব আছে। রোজ রাত্রে ল্যাম্পপোস্টটার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তার গায়ে হাত বুলুই। আর অমনি সে বলতে আরম্ভ ক'রে দেয়। ঝুর্‌-ঝুর্‌ ক'রে বেরিয়ে আসে ঝর্ণাধারার মত তার বুকের মধ্য হ'তে জমিয়ে-রাখা সঞ্চিত চেনামহলের কথা। যত রাত গভীর হয়—তত

যেন তার দিল্ খুলে যায়। খুলে ধরে যেন লাল সালুতে জড়িয়ে-ধরা জীর্ণ তালপাতার পুঁথি। এক একখানা ক'রে পাতা তার তুলে তুলে যায়, আর অমনি ফুটে ওঠে যেন জ্বলন্ত অক্ষরে প্রাণের ভাষা। অজস্র দরদ ও অফুরন্ত স্নেহে মাখিয়ে রেখেছে তার বাণী। ঠাকুরমার রূপকথার মত বড় মিষ্টি লাগে সে-সব জানতে শুনতে ও বলতে।

একদিন ল্যম্পোপোস্টটা বলছিল, ছাখো—নানা মানুষের বুকে নানা মনের নানারকম খেলাও যেম্‌নি দেখেছি, ঠিক তেম্‌নি দেখেছি দিন রাত এইখানে দাঁড়িয়ে থেকে ঐ ঊর্দ্ধে বিরাট আকাশের বুকে নানা রঙের নানা খেলা। কোনো রঙ্‌টাই সেখানে স্থায়ী দেখ্‌লুম না—দেখলুম না তার কোনো খেলার অবিনশ্বরত্ব। বদ্‌লাচ্ছে—বদ্‌লাচ্ছে—কেবলই বদ্‌লাচ্ছে। আকাশ বদ্‌লাচ্ছে, বাতাস বদ্‌লাচ্ছে, জল বদ্‌লাচ্ছে, স্থল বদ্‌লাচ্ছে, নরনারী সবই বদ্‌লাচ্ছে! এ কি অস্থিরতার লীলা—একি খেলা চঞ্চলতার! স্নেহ মায়া দয়া করুণা প্রেম ভালোবাসা—সবই অস্থির—সবই চঞ্চল। যে পৃথিবীর ওপর উঠছি বসছি—চলছি ফিরছি—সেই পৃথিবীই পাগলের মত ঘুরে মরছে আপনার চারিধারে। তা'কে শান্ত স্থির করতে পারছে কে? উপায় নেই—উপায় নেই—ঘুরতে তোমায় হবেই! জন্ম হতে মৃত্যু—মৃত্যু হতে জন্ম—তুমি কেবল ঘুরেই যাবে! চঞ্চলতাই তোমার ধর্ম্ম—অশান্তভাই তোমার প্রকৃতি। হে মানব, তুমি চঞ্চল—চঞ্চল তোমার ইন্দ্রিয়-প্রাণ—চঞ্চল তোমার দেহ-মন। তোমার জ্ঞান চঞ্চল—তোমার বুদ্ধি চঞ্চল—তোমার প্রেম চঞ্চল—তোমার ভালোবাসা চঞ্চল। তোমার দয়া-মায়া—তোমার সুখ-দুঃখ—তোমার হাসি-কান্না—সব চঞ্চল। কিন্তু বলতে পারো, কাকে ধ'রে তোমার এ চাঞ্চল্য রূপ পাচ্ছে? ভাবতে পারো কি ক্ষণিকের তরে, কাকে অবলম্বন ক'রে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের—চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহনক্ষত্র সমেত এই

সুবিশাল ব্যোমের—বিরাট অস্থিরতা খেলে বেড়াচ্ছে? এত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন কোন্ অপরিবর্ত্তনীয়কে নিয়ে—এত নড়ন কোন্ অনড়কে ধ'রে—এত রূপের খেলা কোন্ অরূপের বুকে!

কেমন হতভম্ব হয়ে গেলুম ল্যাম্পপোস্টটের এই উক্তি শুনে। এ কি শুন্‌ছি! এ কি কথা আজ বল্‌ছে ল্যাম্পপোস্টটা! পাগল হ'য়ে গেল না কি! অনেক দেখেছে জেনেছে শিখেছে ব'লেই কি—এবার এমন ক'রে কোন্ অদেখা অজানার ইঙ্গিত দিতে আরম্ভ করলো? তাইত—ব্যাপার কি! আশ্রমে চতুষ্পাঠী টোল খুলে বসলো না তো! দারুণ বিস্ময়ে হতবাকে মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই ল্যাম্পপোস্টটা জিজ্ঞেস করলে, ভূপতি চৌধুরীকে চেন? ভূপতি চৌধুরীকে—সাঁইত্রিশ নম্বর বাড়িতে থাক্‌তো? বুঝিছি—চেন না। নামও শোন নি তার। শোন তবে।

পাড়ার ভূপতি চৌধুরী—অমন পত্নীবৎসল কেউ ছিল না। স্ত্রীর মুখখানা কোনদিন একটু ম্লান দেখলে ভূপতি চৌধুরী চারিধার শূন্য দেখতো। পরিবারের দীর্ঘশ্বাস পড়লে অমনি ভূপতি চৌধুরী ছুটে এসে জিজ্ঞেস করতো, কি হয়েছে গো তোমার? স্ত্রী ক'দিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাক্‌লে ভূপতি ছট্‌ফট্ ক'রে মরতো। এম্‌নি ছিল উভয়ের ভালোবাসা—এম্‌নি ছিল দুজনের মনের মিল। ভূপতি চাকরি করতো এক সাহেব-কোম্পানিতে। ভূপতিরা তিন ভাই—ভূপতি মেজ'। একান্নবর্ত্তী সংসার। ভূপতির একটি ছেলে একটি মেয়ে—মেয়েটিই বড়। হঠাৎ একদিন ভোর বেলা ভূপতির স্ত্রী মারা গেল। একেবারে ধরতে ছুঁতে দিলে না কারোয়। রাত বারোটার পর দু'বার ভেদবমি হয়। নেতিয়ে পড়লো ভূপতির বৌ। বৌকে হাসপাতালে পাঠাতে চাইলো না ভূপতি। সেই রাত্রে বড় ডাক্তার ডেকে আনলে। হুড়্‌হুড়্ ক'রে টাকা খরচ করলে—

একেবারে ঠিক জলের মত ক'ঘণ্টার মধ্যেই। রাত চারটের সময় আবার একজন বড় ডাক্তার এল। কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলে না। পরপারের ডাক ঠেকাতে পারলে না কেউ! শিশি শিশি ওষুধে কিছু হ'লো না—হ'লো না কিছু স্যালাইন ইন্‌জেক্সনে। শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেল। ভূপতির স্ত্রী শেষ নিশ্বাস তখনও ফেলে নি—হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো ভূপতি। পুরুষের কান্না নয়—একেবারে সুরে-বাঁধা মেয়েলি কান্না। বড় ভাই ছোট ভাই ভূপতির হাত ধ'রে যত বোঝায়, ভূপতি তত কেঁদে ওঠে। সে এ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করতে কিছুতেই পারবে না। সে মরবে তার বৌয়ের সাথে—মরবে মরবে—নিশ্চিত মরবে ; কিছুতে না মরে তো শেষে বিষ খেয়ে—

তারপর সূর্য্যোদয়ের ঠিক আগেই ভূপতির বৌ শেষ নিশ্বাসটুকু ফেললে তার স্বামীর মুখের পানে চেয়ে চেয়ে। আর কেউ ধ'রে রাখতে পারে না ভূপতিকে। মেঝের ওপর দুম্ দুম্ ক'রে মাথা ঠুক্‌তে যায়। ছোট ভাই জোর ক'রে টেনে ধরে। টাট্‌কা পত্নীশোকটা কিছুতেই সাম্‌লাতে পারছে না ভূপতি। আগুনের শিখার মত বুকের ভেতরটা দাউ দাউ ক'রে পুড়িয়ে দিচ্ছে ভূপতির। সে কি কাতরোক্তি! সে কি মানসিক বেদনার অভিব্যক্তি! বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে ভূপতি আত্মহত্যা করতে ছুটে যায় মুখে বলতে বলতে, এক চিতায় আমাদের দু'জনকে পোড়াবে—এক চিতায়—এক চিতায়! সাধে বাদ সাধে পাঁচজনে—দৌড়ে এসে ধরে টেনে। ভূপতি কিছুতেই মরতে পায় না। এক চিতায় দু'জনকে পোড়ানোও যায় না। কি হবে—কি হবে! পাড়ায় হৈ-হৈ প'ড়ে গেল সেদিন। জোয়ান ছেলেরা সকলেই ছুটলো চৌধুরীবাড়িতে শোকসন্তপ্ত ভূপতিকে সাম্‌লাতে।

ভূপতির স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে চললো শ্মশানে এই ল্যাম্পপোস্টটার সাম্‌নে দিয়েই। ভূপতি যাচ্ছিল দলের সঙ্গেই। গুম্‌রে গুম্‌রে ঠেলে

ঠেলে উঠছিল তার বুকের মধ্যে চাপা-কান্না। এতক্ষণ বাড়িতে সকলের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তি করেছে ভূপতি। একটু যেন হাঁপিয়েও উঠেছিল। এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে এসেই সকলে হরিধ্বনি দিয়ে উঠলো যেমনি, আর অমনি ভূপতি স্বেচ্ছায় আছড়ে পড়লো ল্যাম্পপোস্টটার গোড়ায়। দু'চোখের জল ঝ'রে পড়ছে অশ্রান্ত ধারায়। সকলে টেনে তুললে তা'কে। নিয়ে চললো হাত ধ'রে সঙ্গে ক'রে। পরে শুনেছিল ল্যাম্পপোস্টটা—শ্মশানে স্ত্রীর জ্বলন্ত চিতায় ভূপতি নাকি একবার লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু এক চিতায় দু'জনে আর পুড়তে পারে নি—সকলে ধ'রে ফেলেছিল তৎক্ষণাৎ।

তারপর বাড়ি ফিরে ভূপতি যেন কেমনতর হ'য়ে গেল। কারোর সাথে কয় না—চুপটি ক'রে ব'সে থাকে নিজের ঘরে। বড় ভা'য়ের স্ত্রী এসে ভূপতির হাত ধ'রে খাওয়ায়—বোঝায়। ভূপতি খেয়ে যায়, কিন্তু কিছু বুঝতে চায় না সান্ত্বনার কথা। আরও কিছুদিন কাটলো। ভূপতি একদিন তার মৃত পত্নীর একখানা ফটো বড় ক'রে তুলিয়ে দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরে এনে ঝুলিয়ে রাখলে দেয়ালে। নিত্য সন্ধ্যার পর গড়ে-মালা এক ছড়া পরিয়ে দিতে লাগলো ছবিতে। দুদিকে দু'টি সুগন্ধি ধূপ জ্বালতে লাগলো। ঘরের মধ্যে ভূপতি ছাড়া আর কারোর সারা রাত থাকবার অনুমতি রইলো না। ছেলে মেয়ে দু'টি মা হারিয়ে তাদের জ্যেঠাইমার কোলে পেলে আশ্রয়। ক্রমে বাড়িতে রটে গেল—ভূপতির বৌ রাত্রে ঘরে আসে। ভূপতি তার সাথে কথা কয়। ওদের অখণ্ড মিলন—মৃত্যুতে খণ্ডিত হবার উপায় নেই। দিনের বেলায় ছবি ছবিই থাকে। রাত্রে তাতে হয় প্রাণের সঞ্চার, ভূপতির একাগ্র প্রেমসাধনার বলে। ঘরের দরজা জানলা চারিধারে বন্ধ থাকে। কেউ কিছু দেখতে বুঝতে পারে না। এই

কিছু না-দেখায় না-বোঝায় রহস্য হ'য়ে ওঠে আরও ঘনীভূত। অ-বোঝা অ-জানাটাই হচ্ছে সৌন্দর্য্য-নৈপুণ্যের চরম পরাকাষ্ঠা। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'লো। ভূপতির বৌ যতদিন বেঁচে ছিল—ততদিন ছিল মানবী। আর আজ মৃত্যুর তুহিনশীতলস্পর্শ পেয়ে ভূপতির মানবী পত্নী ধীরে ধীরে জুড়ে বসলো দেবীর আসন—হ'লো দেবী। মানবীরূপে পেয়েছিল ভূপতির অনন্ত ভালোবাসা। দেবীরূপে পেতে লাগলো ভূপতির অন্তরের শ্রদ্ধা-পূজা। ক্রমে ভূপতি নিজেই প্রকাশ করতে লাগলো, তার স্ত্রীর প্রতি রাত্রে অমন আবির্ভাব-তিরোভাবের কথা। পাড়ার অনেকে শুনলে এ কাহিনী। অমন বাঞ্ছিত মরণ পাড়ার অনেক বৌ মনে মনে কামনা করতে লাগলো। অবিশ্বাসের ধোঁয়া যেটুকু জমে উঠেছিল পুরুষদের বুকে—সেটুকুও ক্রমে ভূপতির কার্য্যকলাপ দেখে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগলো। তাইত—এমন কি হয়! হবেও বা! সাধনায় কিছুই অসম্ভব নয়।

ভূপতি মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলে। কাছাকাছি মঠে আশ্রমে সুরু করলে যাতায়াত। নিত্য স্নান সেরে এক অধ্যায় গীতাপাঠ না ক'রে জলগ্রহণ করত' না। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী দু'একজন আসতে যেতে লাগলো ভূপতির ঘরে। তাঁদের সঙ্গে তত্ত্বকথা আলোচনা করত' ভূপতি। এক একদিন কথা কইতে কইতে এসে দাঁড়াতো এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে। একটু আধটু তাদের কথাবার্ত্তা শুনেছে সে। আচার্য্য শঙ্করের মায়াবাদ বোঝাতেন সন্ন্যাসী ভূপতিকে। ভূপতি শুনতো বেশ মন দিয়ে—শুনতো এই ল্যাম্পপোস্টটাও। শেষে রাত হয়ে যায় দেখে সন্ন্যাসী বিদায় নিতেন। বিদায় দিত ভূপতি সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে প্রণাম ক'রে।

নলহাটি থেকে ভূপতিদের মাসী এসেছিল সেবারে কলকাতায় সূর্য্যগ্রহণে গঙ্গাস্নান করতে। উঠেছিল এসে এখানে চৌধুরীদের বাড়িতে। দিন কয়েক ছিল। ভূপতির হাবভাব দেখে ও বাড়ির বড় বৌ ছোট বৌয়ের মুখে সমস্ত শুনে মাসী বলেছিল গালে হাত দিয়ে, ও মা—এ কি কথা গো! মরা বৌ আবার রাতে ভূপতির ঘরে আসে কি! এমন তো শুনি নি! বৌ তা'লে তো পেত্নী হ'য়ে আছে বাড়িতে। ওঝা আনাও, বৌমা, ওঝা আনাও—ভূপতিকে দেখাও। এ তো ভালো কথা নয়। আমাদের নলহাটিতে বড় ওঝা আছে ভূতের। তা'কে আনতে লোক পাঠাও, বৌমা—লোক পাঠাও। আর দেরি কর' না। শেষে ভূপতির—

কেমন বলতে বলতে থেমে গেল মাসী। 'শেষে ভূপতির—' কি হবে অনুমানে বুঝতে পেরে শিউরে উঠলো বাড়ির সকলে। কথাটা ভূপতির কানে গেল। একেবারে রাগে জ্বলে উঠলো ভূপতি। দিলে কড়া কড়া দু'কথা শুনিয়ে নলহাটির মাসীকে। চুপ ক'রে গেল মাসী। কি দরকার আর বলবার! ভূত-পেত্নী নিয়ে ঘর করতে চাও—কর'! পাঁচটা ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। বুঝ্‌তে পারবে শেষে। এই কথা বৌ'য়েদের ব'লে, গ্রহণে গঙ্গাস্নান সেরে, আঁচলে পুণ্যিটুকু গেঁট দিয়ে বেঁধে, দিন সাতেক থেকে—নলহাটির মাসী ফিরে গেল নলহাটিতে।

হঠাৎ ভূপতি চাকরি দিলে ছেড়ে। কোথা থেকে ছুপিয়ে আন্‌লে গেরুয়া কাপড়। অনিত্য সংসারে মন আর বসলো না তার।

একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে ছোপানো গেরুয়া কাপড়খানা প'রে বেরিয়ে গেল ভূপতি কারোয় কিছু না ব'লে। দিন দশেক ধ'রে খোঁজা-খুঁজি করছে ভা'য়েরা। হদিস কিছু পায় না কোথাও। তারপর পুষ্কর তীর্থ থেকে এলো একদিন ভূপতির চিঠি—তার বড় ভা'য়ের নামে। পরিষ্কার কথা—ভূপতি সন্ন্যাস নিয়েছে পুষ্করে। ছেলে-মেয়ে সংসারের ওপর তার আর কোন টান নেই। সে ঘুরে বেড়াবে ভারতের তীর্থে তীর্থে—মঠে মঠে—আশ্রমে আশ্রমে। এমনি ক'রে সে দেবে তার বাকি জীবনটা কাটিয়ে।

কথাটা পাড়ায় রটে গেল বেশ। বন্ধ হ'লো খোঁজা-খুঁজির হ্যাঙ্গাম। ল্যাম্পপোস্টটার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকে আলোচনা করলে অনেক ভূপতির সম্বন্ধে। অমন পত্নীপ্রেম-ভালোবাসা বড় একটা দেখা যায় না কারোর। বৌ মরেছে আজ এক বছর হ'লো না—ভূপতি অমনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল। কে একজন ব'লে উঠেছিল, সত্যি—কথায় আছে না, 'ভাগ্যিবানের বৌ মরে'—তা কথাটা একেবারে খাঁটি সত্যি—নইলে ভূপতি সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল কি ক'রে! ধন্য ভূপতি—তুমি ধন্য!

এর বছর দুই পরে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গেছলো পাড়ার তিন জন। ফিরে এসে খবর দিলে, প্রয়াগে ভূপতিকে দেখেছে তারা—ঠিক চিনতে পেরেছিল তা'কে। সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে ব'সে রয়েছে। গলায় ইয়া বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—মাথায় ইয়া প্রকাণ্ড মোটা জটা, ভেঙে পড়েছে যেন চ্যাপ্টা গোদা পায়ের মতন। তার সঙ্গে কথা কইতে যাবে সন্ধ্যাবেলা, ঠিক করেছিল সকলে। তারপর—আর ভূপতিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বোধ হয়—যোগবলে জানতে পেরেছিল ভূপতি, পাড়ার লোক এসেছে। সাধু সজ্জন লোক—সংসারী লোকেরা বড় বিরক্ত করে তাদের। তাই তাঁরা ধরা ছোঁয়া দেন না।

খবরটা শুনে কেউ কেউ কপালে হাত ঠেকিয়ে সন্ন্যাসী ভূপতির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়েছিল সেদিন। সেটা জানা আছে ল্যাম্প-পোস্টটার।

বছর আষ্টেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় চৌধুরীবাড়িতে একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ্ ভাড়াটে গাড়ী এসে থাম্‌লো। তা' থেকে নাম্‌লো ভূপতি। ছোপানো গেরুয়া আর তখন অঙ্গে নেই। পরণে মিলের ধুতি—অঙ্গে ছিটের সার্ট। ভূপতি হাত ধ'রে নামালে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে—স্ত্রীর কোলে তিন বছরের একটি ছেলে। মালপত্র বোঝাই গাড়ীর মাথায়। হাঁক-ডাক ক'রে নামাতে লাগলো এক এক ক'রে সে-সব ভূপতি। পাড়ার অনেকেই ছুটে এলো দেখতে।

দেখতে দেখতে পরের দিন বেশ ভিড় জমে উঠলো ল্যাম্পপোস্টটার চারিধারে। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি! ব্যাপার বেশ ভালোই। ভূপতি বলেছে—গুরুর আদেশে তাকে পুনরায় সংসারী হ'তে হ'লো। বিয়ে হয়েছে আজ পাঁচ বৎসর। কানপুরেই ভূপতির শ্বশুরবাড়ি। এতদিন ঘরজামাই হয়ে ছিল। আর থাকা ভালো দেখায় না, কেননা ভূপতির শাশুড়ী আজ দু'মাস হ'লো দেহ রেখেছে। নিজের ঘরবাড়ি থাকতে কেন আর শালা-শালাজদের সংসারে থাকতে যাবে! তাই চলে এসেছে এখানে।

—বেশ—বেশ—ভালো—ভালো।

আর কেউ কিছু বললে না।

দিন তিনেক পরে পাড়ার নুটু লাহিড়ী দাঁড়িয়েছিল সকালবেলায় এই ল্যাম্পপোস্টটার পাশে। মুচি খুঁজছিল; পায়ের জুতো জোড়াটা ছিঁড়ে গেছে—সারাবে। দেখতে পেলে—ভূপতি চৌধুরী আসছে। পরিবারের সাড়িটা লুঙ্গির মত ক'রে ঘুরিয়ে পরেছে—গায়ে একটা

ছেঁড়া সুতির গেঞ্জি। কোলে তিন বছরের সেই নতুন ছোট ছেলেটা। হাতে একটা কাঁসার আধসেরি ঘটি।

কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলে নুটু লাহিড়ী, কি হে ভূপতি—কোথায় চললে ?

—এই যাবো, ভাই, একবার গোহাটায়—দুধ আনতে।

—তারপর—অনেক তীর্থ তো ঘুরে ফিরলে। গল্প শোনাবে কবে ?

ভূপতি বললে, শোনাবো ভাই, শোনাবো—সে সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা—বিচিত্র বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দাঁড়াও, ভাই—এই তো ক'দিন এসেছি—আগে একটা কাজকর্ম্ম কোথাও জোগাড় ক'রে নিই—তারপর সব বলবো। কি জানো—অনেক খুঁজে খুঁজে এ জীবনে গুরু যা' করেছি, অমন গুরু কেউ পায় না। কি ক্ষমতা! চোখের সামনে দেখলুম, পায়ে হেঁটে যমুনা পার হ'য়ে গেলেন। এ-হেন গুরুবাক্য লঙ্ঘন করবার সাধ্য কি! বলবো, ভাই, বলবো—আমার গুরুদেবের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা আছে—বলবো'খন। যাই—দেরি হ'য়ে গেলে আবার দুধটা খাঁটি পাওয়া যাবে না, অমনি ব্যাটারা জল মিশুবে।

এই ব'লে হন্ হন্ ক'রে একটু এগিয়ে গিয়ে ভূপতি মুখটা ফিরিয়ে আবার বললে, নুটু, একটু দেখো ভাই—কাজকর্ম্ম একটা যদি সন্ধানে থাকে তো ব'লো আমায়।

নুটু লাহিড়ী ভূপতির সমবয়সী। আর কিছু বলে নি সেদিন। শুধু ঘাড়টা একটু নেড়ে জানিয়েছিল ভূপতিকে। কিন্তু আর থাকতে পারে নি—হঠাৎ ব'লে উঠেছিল এই ল্যাম্পপোস্টটা, ধন্য ভূপতি—তুমিই ধন্য !

থেকে থেকে এক কাণ্ড ক'রে বসলো সুধা বোসের ভাই কনক বোস। তার ধাক্কা চললো বেশ। হঠাৎ একদিন রাত বারোটার সময় একখানা মটর এসে দাঁড়ালো ল্যাম্পপোস্টটার কাছে। গাড়ি থেকে নামলেন একজন বড় ডাক্তার। পরিমলবাবু 'কল্' দিয়ে নিয়ে এলো। সুধার মায়ের অবস্থা ভালো নয়। ল্যাম্পপোস্টটার আলো এসে পড়েছে সামনের বারান্দার ওপর। ওর মাথা থেকে দেখা যায় ঘরের ভেতরটা। মায়ের মাথার কাছে ব'সে আছে সুধা। পাখার বাতাস করছে ধীরে ধীরে মাকে। সুধার মা নীরবে চোখের জল ফেলছে আর ছড়াচ্ছে হা-হুতাশ। বোঝাচ্ছে সুধা। বলছে, চুপ কর' মা—চুপ কর'। তুমি অমন ক'রে কেঁদে কি আর কনককে বোঝাতে পারবে ? সে যেখানে খুশি যাক্—যা ইচ্ছে করুক। তার কথা মন থেকে একেবারে ছেঁটে ফেলে দাও, মা—যদি বাঁচতে চাও।

সুধা নিজের আঁচল দিয়ে মায়ের চোখ মুছিয়ে দিলে।

সব দেখেছে ল্যাম্পপোস্টটা। সমবেদনায় সহানুভূতিতে বুকটা ভ'রে উঠেছিল ওর। নিঃস্ব সংসারে এ কি দস্যিপনা !

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন ভালো ক'রে সুধার মাকে। সুধার পাশেই দাঁড়িয়েছিল পরিমলবাবু। স্টেথিস্‌কোপটা কান থেকে নামিয়ে ডাক্তার বললেন, বুকের অবস্থা ভালো নয়—খুবই খারাপ। যে কোন মুহূর্ত্তে হার্টফেল করতে পারে।

কনক বাড়ি থেকে পালিয়েছে আজ পাঁচ দিন। তার মার বাক্সে টাকাকড়ি—গয়না-গাঁটি যা কিছু ছিল—সব একেবারে ধুয়ে

মুছে নিয়ে গেছে সঙ্গে—সকলের অজ্ঞাতসারে। ব্যাপারটা জানতে পারা গেল রাত্রে, যখন কনক আর বাড়ি ফিরলো না। সারা রাত সুধা ও সুধার মা ব'সে কাটিয়েছে বারান্দায় ল্যাম্পপোস্টের আলোয় পথের পানে চেয়ে। পরিমলবাবু খুঁজে বেরিয়েছে এদিক ওদিক। কনকের সন্ধান কিন্তু পাওয়া গেল না কোথাও। নাগপুর থেকে পরে চিঠি এল কনকের। মাকে লিখেছে বোম্বাইয়ের পথে যেতে যেতে। 'ফিল্ম-আর্টিষ্ট' হ'তে চলেছে সে অমন ক'রে বাক্স ভেঙে। সুধার মা আধা-শয্যা বরাবরই নিয়ে আছে। এবার সমস্ত শুনে নিলে পূর্ণ-শয্যা। সুধা আপ্রাণ বোঝায়—বোঝায় ঘরে এসে পরিমলবাবু। কিন্তু বোঝালে কি হবে—মার মন প্রবোধ মানে না। সান্ত্বনা পেতে যন্ত্রণা এড়াতে নিজেই কাঁদে খালি।

ডাক্তার সব শুনলেন। ওষুধের ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন, মানসিক উত্তেজনা না কমালে ওষুধে কিছু করবে না। নির্দ্দেশ দিলেন পরিমলবাবুকে—কাল সকালেই যেন তাঁকে রুগীর অবস্থা জানিয়ে খবর দেওয়া হয়।

পরিমলবাবু ওষুধ কিনে নিয়ে এল। এক দাগ সুধা জোর ক'রে তার মাকে খাওয়ালে। খাবে না কিছুতেই। খানিক পরে সুধার মা হঠাৎ বায়না ধরলে—বললে, আমি বোম্বাই যাবো। আমাকে সেখানে নিয়ে চল্, সুধা।

পরিমলবাবু ঘরেই ছিল—বলে উঠলো, সে কি!

বললে সুধা, এ অবস্থায় তুমি কেমন ক'রে যাবে, মা? জোর ক'রে যেতে গেলে তুমি যে পথেই মারা পড়বে।

—না—আমি মরবো না। আমার কিছু হয় নি। ডাক্তার বদ্যি আর আমায় দেখাতে হবে না—ওষুধ আমি কিছুতেই খাবো না। আমি যাবো—বোম্বাই যাবো—

এই ব'লে ধড়্‌মড়্‌ ক'রে বিছানার ওপর উঠে বস্‌তে চাইলে সুধার মা।

পরিমলবাবু হাঁ-হাঁ ক'রে উঠ্‌লো। জোর ক'রে চেপে ধরলে সুধা। আশ্বাস দিয়ে পরিমলবাবু বললে, আচ্ছা মাসিমা—তাই হবে'খন। আপনাকে নিয়ে যাবো—কথা দিচ্ছি। এত রাত্রে তো আর যাবার ট্রেণ নেই। কাল সকাল হোক্—তারপর দেখা যাবে।

তরল বেদনা গড়িয়ে পড়লো হু-হু ক'রে সুধার মায়ের দু'চোখ দিয়ে। একটা বুকফাটা হাহাকারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো সুধার মা, কনক—কনক রে!

সুধার সে দৃশ্য আর ভালো লাগছিল না দেখতে। বললে, মা, চুপ কর'। কনক তোমার মরে নি—বেঁচে আছে। তুমি অত আকুল হ'য়ে পড়ছ' কেন? এত দুর্ব্বল হ'য়ে ভেঙে পড়লে চলবে কেন, মা।

এক রকম মায়ে-ঝিয়ে স্নেহ-ভালোবাসার ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে রাতটুকু কাটলো। সকাল হ'তেই কেমন ঝিমিয়ে পড়লো সুধার মা। একটা কেমন যেন আচ্ছন্ন অবস্থা এলো। আর মুখে কিছু বলেও না। কেবল ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকে সুধার মুখের দিকে।

পরিমলবাবু ঘরে আসতেই জিজ্ঞেস করলে সুধা, এখন কি করা যায়, পরিমলদা'?

—এ কি—এমন অবস্থা কখন থেকে হয়েছে?

—ভোর থেকেই।

—আমায় ডাকো নি, কেন?

—আপনি তো সেই সবেমাত্র শুতে গেলেন। সারা রাত তো এইখানেই ব'সে ছিলেন। তাই আর ডাকাডাকি করি নি।

পরিমলবাবু সুধার মায়ের অবস্থা দেখে বললে, যাই—আমি

ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি। তুমি, সুধা, ততক্ষণ আর এক দাগ ওষুধ চামচ ক'রে খাইয়ে দাও।

সুধা বললে, আর ওষুধ খাইয়ে কিছু হবে না, পরিমলদা'। বেশ বুঝতে পারছি—

কথাটা আর শেষ করলে না। পারলে না শেষ করতে। সুধার কণ্ঠ কেমন যেন রুদ্ধ হ'য়ে এলো, আসন্ন সর্ব্বনাশের কথাটা বলতে গিয়ে।

পরিমলবাবু অমনি ব'লে উঠলো, না—না—ওকি কথা—ছিঃ! এ বিপদে দেখ্‌ছি—তুমিও শেষে ভেঙে পড়লে!

সুধা ঝর্‌ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে। এতক্ষণ সে বেশ শক্ত ছিল; কিন্তু আর পারছে না—বুক বেঁধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে এ দুর্দ্দৈবের সঙ্গে লড়াই করতে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, পরিমলদা', এ ক'দিন কিছু বলি নি। কিন্তু আর না ব'লে থাক্‌তে পারছি না। কনক একটা পয়সা ঘরে রেখে যায় নি।

'আচ্ছা-আচ্ছা—তার ব্যবস্থা হবে'খন'—ব'লে পরিমলবাবু বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে ডাক্তার আনতে।

সুধা ডাকলে—বললে, পরিমলদা', শুনুন—এই নিন আমার গলার হারছড়াটা। এইটে স্যাঁকরার দোকানে বেচে টাকা কিছু নিয়ে আসতে হবে আজই।

—না—না—ও হার বেচবার দরকার হবে না। আমি তার ব্যবস্থা করছি—

এই ব'লে পরিমলবাবু মুখ ফেরাতেই সুধা অমনি খপ্ ক'রে পরিমলবাবুর হাতখানা ধ'রে তার গলার সরু হারছড়াটা জোর ক'রেই হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললে, পরিমলদা'—উপস্থিত এই ব্যবস্থাটা আগে করুন। পরের ব্যবস্থা পরে হবে'খন।

ঠিক এমন সময় তরুবালা হঠাৎ দরজার নিকট এসে থমকে দাঁড়িয়ে দু'জনের হাত ধরা-ধরিটা লক্ষ্য করলে। তরুবালাকে দেখতে পেয়ে সুধা ছেড়ে দিলে পরিমলবাবুর হাতখানা। সোনার হারছড়াটা অমনি ঝপ্ ক'রে পড়ে গেল মেঝের ওপর। পরিমল বাবু সেটা তুলে সুধার হাতে জড়িয়ে দিয়ে বললে, এখন এটা রেখে দাও, সুধা। আমি আগে ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনি।

ঘরের মধ্যে আর দাঁড়ালো না পরিমলবাবু। বেরিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

তরুবালার মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। পরিমলবাবুর সঙ্গে সুধার এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা কেমন ধারা যেন ঠেকলো তার কাছে। আজ অনেক দিন ধ'রে তরুবালা লক্ষ্য ক'রে আসছে সেটা। কনক চলে যেতে এ ক'দিন যেন ব্যাপারটা খুবই বাড়াবাড়ি হয়ে উঠছে। সুধার মায়ের অসুখের জন্যে পরিমলবাবু বড় একটা নিজের ঘরে থাকে না। ওপরে সুধাদের ঘরেই ব'সে থাকে। তরুবালা এতে একটু কটাক্ষপাত পূর্ব্বেই করেছিল। কিন্তু তাতে কান দেয় নি পরিমলবাবু।

জিজ্ঞেস করলে তরুবালা, তোমার মা কেমন আছে, সুধা ?

—ভালো নেই।

—তোমার দাদা তো কাল সারা রাত ওপরেই কাটিয়ে গেল, দেখলুম। এখন আবার ছুটলো ডাক্তার আনতে। খুব বাড়াবাড়ি না কি !

সুধা বললে, হ্যাঁ—বৌদি।

তারপর সুধা গিয়ে দাঁড়ালো তার মায়ের কাছে। তরুবালা একবার ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে সুধার মাকে দেখে নেমে এলো নীচেয়।

প্রায় আধঘণ্টা পরে পরিমলবাবু ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে এল। ডাক্তারবাবুর ব্যাগটা পরিমলবাবুর হাতে। ঘরে ঢুকেই দেখে, সুধা তার মায়ের বুকের ওপর মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে।

পরিমলবাবু তাড়াতাড়ি ডাকলে, সুধা—সুধা—ডাক্তারবাবু এসেছেন।

বিস্রস্ত আলুলায়িত কেশপাশ—সজল মলিন মুখখানা তুলে—ছ'হাতে সরাতে সরাতে সুধা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠলো, পরিমলদা', আর ডাক্তারবাবুর দরকার নেই। মা আমার চলে গেছে।

পরিমলবাবু বললে, এ্যা—সে কি !

ডাক্তারবাবু সুধার মায়ের মুখপানে চেয়ে বললেন, Yes—expired.

জিজ্ঞেস করলে পরিমলবাবু, কতক্ষণ ?

সুধা বললে, এই মাত্র।

ডাক্তারবাবুকে নিয়ে পরিমলবাবু ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

একটা সজোরে চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সুধা আবার মুখ ঢাকলে তার মায়ের বুকের ওপর। চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠে সারা বোস বাড়ীর লোক ঘরের মধ্যে জড় করতে চাইলে না সুধা। বেদনার মুখরতা চেপে ধরলে সে প্রাণপণ বলে। কি নিদারুণ রাগ অভিমান না তার জাগতে লাগলো কনকের ওপর! কোন কিছু প্রকাশ করলে না সুধা। অন্তর্ভেদী ব্যথার প্রবাহ কেবলি আপন মনে বারবার পাক খেতে লাগলো তার বুকের মধ্যে—রুদ্ধমুখ গিরি-গহ্বরে আবদ্ধ ঝর্ণাধারার মত !

প্রায় একমাস পরে একদিন পরিমলবাবু সন্ধ্যার পর সুধার ঘরে এলো। সুধা কি একখানা বই পড়ছিল। পরিমলবাবুকে বসতে ব'লে সুধা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, আজ আর ছাত্র পড়াতে যান্ নি ?

—গেছলুম। ছাত্র আজ পড়বে না—মামার বাড়ি গেছে। তারপর—বম্বে থেকে কনকের কোন চিঠি এসেছে ?

সুধা বললে, না। কনকের চিঠি যেন আর আমার কাছে একেবারে নাই-ই আসে।

—কনকের ওপর রাগ অভিমান করলে কি হবে বল'। সংসারের সব ছেলেই কি সুশীল সুবোধ হয় !

—তা হয় না জানি। কিন্তু এমন পাষণ্ড দুর্বোধ যে হয়—তা আমি জানতুম না, পরিমলদা'।

—কনককে তো একটা খবর দেওয়া গেল না দেখ্‌ছি।

সুধা বললে, কি হবে আর খবর দিয়ে ! খবর পেয়েই বা সে আর কি করবে ? ঘটা ক'রে সেখানে মা'র শ্রাদ্ধ করবে না কি ! আর তা ছাড়া—কেমন ক'রেই বা তা'কে জানাবো ? তার ঠিকানা তো জানি না আমরা।

পরিমলবাবু একটু চুপ ক'রে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলে, সুধা, তুমি একলাটি অমন চুপ ক'রে বাড়তে ব'সে থেক' না।

সুধা বললে, কি আর করব' বলুন। তাইতো কাল সন্ধ্যার পর আপনার মেয়ে রেবাকে ওপরে ডাকছিলুম।

—কেন ?

—ও আমার কাছে থাকবে—আমি ওকে রোজ একটু একটু পড়াতুম।

—তা বেশ তো!

—কিন্তু বৌদি ওকে আসতে দিলে না। মেয়েটার লেখাপড়া শেখবার খুব ঝোঁক। ওর মার ধারণা না কি—লেখাপড়া শিখলে রেবা আমার মত নষ্ট হয়ে যাবে।

পরিমলবাবু পরিহাস ক'রে বললেন, তা লেখাপড়া শিখে তোমার মত নষ্ট হয়ে যায়—যাক্ না।

—আপনি বললে তো হবে না। ওর মায়ের হুকুম চাই।

—আচ্ছা—আমি ওর মায়ের হুকুম আদায় ক'রে দোব'খন।

তারপর জিজ্ঞেস করলে সুধা, একটা কথা বলবো, পরিমলদা' ?

—কি বল' না।

—রেবা রাত্রে আমার কাছে শু'লে আপনাদের কিছু আপত্তি আছে ? ওপরে কেউ নেই—একা আমি—ঘরগুলো বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে!

সানন্দে ব'লে উঠলো পরিমলবাবু, না—না—আপত্তি কিছুমাত্র নেই। এ তো ভালো কথাই। তুমি মেয়েছেলে—ওপরে একলাটি থাকো—আমিও ক'দিন তাই ভাবছিলুম। বেশ—তাই হবে। তোমায় তবু ব'লে রাখছি, সুধা—রাত বেরাতে দরকার হ'লে—তুমি তৎক্ষণাৎ আমায় ডাক্‌বে—কোনও রকম কিন্তু বোধ করবে না। আমি বরাবর সজাগই থাকি—জান্‌বে। তোমার জিনিষ-পত্র বাজার যা কিনে আনতে হয়—আমায় বল্‌বে—মোটেই লজ্জা করবে না।

সুধা বললে, আপনাকে তো বরাবরই ব'লে আসছি, পরিমলদা'—কোনদিন তো লজ্জা বোধ করি নি। আগে যাও করতুম—মা

মারা যাবার পর সেটুকুও আর করি না। তবে আমার পক্ষে যতটা স্বাবলম্বী হ'য়ে থাক্‌তে পারা যায়—ততটাই ভালো।

—সে তো নিশ্চয়।

—শুনুন পরিমলদা', কাল সকালে শিকদার মশাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

—কে শিকদার মশাই?

—ঐ সামনের বাড়ির বনমালী শিকদার।

ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে পরিমলবাবু জিজ্ঞেস করলে, কেন?

সুধা বললে, রাঁচিতে ছিলেন। দিন কয়েক এসেছেন। এসে শুনেছেন—আমার মা মারা গেছেন। তাই একবার দেখা করতে এসেছিলেন।

—নিছক ভদ্রতা দেখাতে?

—তা জানি না—তবে আমার অবস্থা সব শুনে সমবেদনা জানিয়ে বলেছেন, ওঁর হাতে একটা application দিতে হবে—

বাধা দিয়ে পরিমলবাবু ব'লে উঠলো, কিসের application—charity'র?

সুধা বললে, তা জানি না, পরিমলদা'। শিকদার মশা'য়ের সঙ্গে আজকাল অনেক বড় বড় সাহেব সুবোর আলাপ হয়েছে। আমার একটা চাকরি উনি ক'রে দেবেন, বলেছেন—দু'শ টাকা মাইনের। কাজ কর্ম্ম তেমন কিছু নয়। সারা দিনে খানকয়েক চিঠি draft ক'রে দিতে হবে। তাদের দরকার একজন শিক্ষিত female candidate.

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পরিমলবাবু জিজ্ঞেস করলে, তা সুধা, শিকদার মশা'য়ের হাতে তুমি application দিয়েছ না কি?

সুধা বললে, দিই নি এখনো। ভাবছি—দোব কি না! উনি কাল

সকালে নিজে এসে আমার কাছ থেকে application নিয়ে যাবেন—ব'লে গেছেন।

—তবু ভালো—তিনি গতকাল এসে তোমার দৈন্য দূর করবার জন্যে তোমার ঘরে ঝাঁকা ক'রে টাকা ঢেলে দিয়ে যে যান নি—এইটাই রক্ষে! শুনেছি, শিকদার মশাই আজকাল অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। বাড়িখানা অমন তৈরি করলেন, দেখলুম। কিন্তু ওঁকে তো এখানে থাকতে বড় একটা দেখি না। নিজের কাজে বাইরে বাইরে ঘোরেন তো জানি।

—হ্যাঁ তাই। এখানে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। ওঁর স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে—তারা সব থাকে কৃষ্ণনগরে দেশের বাড়িতে।

—এখানে একদম আসে না তারা?

—না। কি জানি কেন—তাদের এখানে নিয়ে আসেন না।

—তা'হলে অত বড় বাড়িখানায় থাকে কারা?

—শুনেছি ওঁর কর্ম্মচারীরা। আর থাকে ঝি চাকর বামুন।

পরিমলবাবু একটু চুপ ক'রে রইলো। চিন্তা করতে লাগলো কি যেন। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, সুধা, শ্রীনাথ ময়রাকে তোমার মনে পড়ে?

—খুব মনে পড়ে। তার দোকান থেকে কতবার খাবার কিনে এনে খেয়েছি ভাই বোনে।

—একটা কানা ঘোষা শুনতে পাই, শ্রীনাথ ময়রার বৌ নাকি—

বাধা দিয়ে সুধা ব'লে উঠলো, প্রমীলাদি'কে তো দেখলুম—সেদিন মটর থেকে নামলেন শিকদার মশা'য়ের সঙ্গে। বোধ হয় রাঁচি থেকে ফিরলেন একত্রে।

পরিমলবাবুর বিস্মিত কণ্ঠের একটা ধ্বনি বেরুলো—এ্যা!

সুধা বললে, ওঁরা যখন মটরে ক'রে এলেন—আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আজ প্রায় পাঁচ ছ'বছর হবে—প্রমীলাদি' নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। অনেকদিন পরে দেখলুম—প্রমীলাদি'কে আর চেনাই যায় না।

পরিমলবাবু বললে, তোমার প্রমীলাদি'ও বোধ হয় পাড়ার কাউকে এখন আর চিনতে পারেন না। যাক্—তুমি এখন কি ভেবে ঠিক করলে, সুধা—হিতৈষী শিকদার মশা'য়ের হাতে application দেবে না কি ?

—আপনাকে তো তাই জিজ্ঞেস করছি—কি করব' বলুন।

পরিমলবাবুকে আর কিছু তখন বলতে হ'লো না। ঠিক সেইসময় বনমালী শিকদারের একজন দরোয়ান সিঁড়ি দিয়ে বরাবর উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলো, দিদিমনি—দিদিমনি—

—কে ?

বেরিয়ে এলো সুধা ঘর থেকে। পেছন পেছন এলো পরিমলবাবু।

দরোয়ান বললে ভাঙা-হিন্দি ও ভাঙা বাঙ্‌লায় মিশিয়ে, দিদিমনি, বাবুজি সেলাম দিয়া। আপ্‌কো বোলাতে হ্যায়—আইয়ে।

কপালখানা কুঁচ্‌কে এক ঝলক বিরক্তি ও রাগ প্রকাশ ক'রে বেশ জোর গলায় সুধা ব'লে উঠলো, দরোয়ানজী, আপ্‌ সোজা চলা যাইয়ে। শিকদারবাবুকো বোল্ দেনা—দিদিমনি আপ্‌কা নকর নেহি হ্যায়।

হিন্দুস্থানী দরোয়ান কেমন থতমত খেয়ে গেল। বাঙালী মেয়ের উগ্রমূর্ত্তি কখন' দেখে নি—শোনে নি অমন তেজী বুলি বাঙালী মেয়ের মুখে। কাঁচুমাঁচু হ'য়ে চলে যাচ্ছিল সে। সুধা ডাকলে—বললে, আউর এক্ বাৎ, দরোয়ানজী, আপ্‌ কভি ইসিমাফিক্ ফিন্ হিঁয়া মৎ আইয়ে।

দরোয়ান চলে গেল বনমালী শিকদারকে খবর দিতে। সুধার চোখ মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। ফুলছে যেন চাপা অভিমানে—ব্যক্ত অপমানে। পদদলিত সর্পের মত সুধা যেন উদ্যত-ফণা—দংশনোদ্যতা। সুধার এ মূর্ত্তি পরিমলবাবু পূর্ব্বে কখনও দেখে নি। বেশ উত্তেজিত হয়ে সুধা ঘরে ঢুকলো এসে। পরিমল বাবু আর তখন দাঁড়ালো না। ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

ল্যাম্পপোস্টটার মাথায় পরিষ্কার আলো জ্বলছে। চেয়ে আছে একদৃষ্টে সেইদিকেই। সব দেখছিল—শুনছিল।

পরিমলবাবু ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলে, তরুবালা তার ছেলে মেয়ে দু'টিকে খাওয়াতে বসেছে। পাশে চাপা দেওয়া আছে পরিমল-বাবুর খাবার। পরিমলবাবুকে দেখেই তরুবালার মুখখানা কেমন ভারি হয়ে উঠলো! ছোট ছেলেটার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে ব'লে উঠলো, নাও না—যা' পারো দু'টো গিলে—আমায় শান্তি দাও না। আর জ্বালাচ্ছ কেন?

বললে পরিমলবাবু, ওগো শুনছ—রেবাকে খাইয়ে ওপরে পাঠিয়ে দাও। ও সুধার কাছে রাত্রে শোবে'খন। সুধা একলা থাকে—

তৎক্ষণাৎ পরিমলবাবুর কথাটায় বাধা দিয়ে সঝঙ্কারে ব'লে উঠলো তরুবালা, ছোট ছেলেটার মুখের মধ্যে জোর ক'রে এক গ্রাস ঝোল-মাখা ভাত বুড়ো আঙুলের টিপ্ নিতে ঢুকুতে ঢুকুতে—রেবা ওপরে যাবে না শুতে—এইখানেই শোবে। তোমার প্রাণ কাঁদে—সুধার ঘরে তুমি শোওগে যাও। আর তোমায় নামতে হবে না ওপর থেকে।

—আমি ওপরে সুধাপিসির কাছে শোব, মা।

বায়না ধরলে রেবা।

রাগের মাথায় রেবার ঘাড়ে একটা ঠেলা দিয়ে তীব্র তিরস্কারে শাসনের সুরে ব'লে উঠলো তরুবালা, চুপ্!

ল্যাম্পপোস্টটার চোখ পড়লো এবার বনমালী শিকদারের দোতলার বৈঠকখানায়। বনমালী শিকদার বর্ম্মা চুরুট ছেড়ে এবার পাইপ ধরেছে। পরণে একটা পাত্‌লা ডোরাকাটা পায়জামা—গায়ে একটা সিল্কের সার্ট। শুয়ে আছে সেদিনের ইংরিজি খবর-কাগজখানা হাতে ধ'রে একটা ইজি চেয়ারের ওপর। হিন্দুস্থানী দরোয়ান জানিয়ে গেছে, সুধা যা বলতে বলেছিল। একটু পরে ডেকে পাঠালে প্রধান কর্ম্মচারী শিবপদবাবুকে। শিবপদবাবু ঘরে আসতেই জিজ্ঞেস করলে তা'কে বনমালী শিকদার, শিববাবু, পানাগড় মিলিটারী ক্যাম্পে কাল মালগুলো পাঠানো হয়েছে কি ?

শিববাবু বললেন, আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

—রাঁচিতে মালগুলো পাঠাবার কতদূর ব্যবস্থা করেছেন ?

—কালকের মধ্যেই সব জোগাড় হ'য়ে যাবে। পরশু বুক্ (book) করব' রেলে।

বনমালী শিকদার বললে, দেখুন শিববাবু—wagon যদি একান্ত না পাওয়া যায়, আপনি direct লরীতে মালগুলো পাঠিয়ে দেবেন। সাহেব আমাকে সেইরকম ব'লে দিয়েছে। Very urgent জান্‌বেন।

—আচ্ছা—তাই হবে।

পাইপের আগুন নিবে গেছে। বনমালী শিকদার দেশলায়ের কাটি জ্বেলে পাইপের গর্ত্তে আগুন ধরালে। একটা আল্‌তো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে। শিবপদবাবু একটু দাঁড়িয়ে চলে আসছিলেন। বনমালী শিকদার অমনি ডাক্‌লে, শিববাবু।

—আঁজ্ঞে—বলুন।

—আজ সকালে কি একটা কথা আমায় বল্‌ছিলেন, ঐ সামনের বোস বাড়ি সম্বন্ধে ?

—ওরা বাড়িখানা এবার সকল শরিক মিলে বেচতে চায়।

—বলেন কি—সকলে একমত হয়েছে ? গত বছর তো একবার বেচবার কথা উঠেছিল ; কিন্তু অনেকেই—পরে শুনলুম—রাজী হয় নি বেচতে।

—এবারও কেবল এক শরিক্ অমত করছে।

—কা'রা ?

—নগেন বসুর মেয়ে—সুধা। ওর এক ছোট ভাই বাক্স ভেঙে টাকা পয়সা গয়না নিয়ে পালিয়েছে কোথায়। এখনও তো ফেরে নি।

জিজ্ঞেস করলে ধীরে ধীরে পাইপে টান দিতে দিতে বনমালী শিকদার, ওদের কতটা অংশ ?

শিবপদবাবু বললেন, শুনিছি—মাত্র ছ'আনা।

—তা'হলে চোদ্দ আনা এখনি কিনতে পারা যায় ?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

একটু পরে বাঁ হাতে পাইপটা মুখ থেকে টেনে ধ'রে বনমালী শিকদার বললে, বেশ। শিববাবু আপনি বোস বাড়ির চোদ্দ আনা অংশ শীগ্‌গীর কেনবার ব্যবস্থা করুন। যা' দাম চায়—তাইতেই আমি রাজী। আর একটু নজর রাখবেন—নগেন বসুর ছেলেটা ফিরলেই তা'কে যেমন ক'রে হোক্—হাত করবেন।

শিববাবু বললেন, তা'কে হাত করতে বেশি বেগ পেতে হবে না। ছেলেটা তো দেখেছি এখানে থাকতে একেবারে কাপ্তেন হয়ে উঠেছিল। কিছু টাকা দিলেই হাতে আসবে। কিন্তু ওর বোন ঐ সুধা মেয়েটা লেখাপড়া শিখেছে—তার তেজ অহঙ্কার বড় !

বনমালী শিকদার বললে, ওটা কিছু নয়। গরীবের তেজ অহঙ্কার ছাইয়ের গাদা। একটু জোরে হাওয়া দিলেই উড়ে যাবে। যেমন ক'রে হোক্—বোস বাড়ির যোল আনা কিনতেই হবে। আপনি, শিববাবু, লোক লাগান।

—আজ্ঞে—তাই হবে।

এই ব'লে শিবপদবাবু চলে গেলেন।

বনমালী শিকদার কাগজখানা সম্পূর্ণ খুলে একবার মুখের সামনে তুলে ধরলে। খানিক পরে বনমালী শিকদারের খানসামা ঘরে ঢুক্‌লো। সাজিয়ে দিয়ে গেল বনমালী শিকদারের খানা। খানা-পর্ব্ব শেষ হ'লে আরম্ভ হ'লো পান-পর্ব্ব। ভালো বিলিতী মদের বোতল ও একটা পেগ্ গ্লাশ বনমালী শিকদারের সামনে টি'পয়ের ওপর সাজিয়ে রেখে গেল। গলা ভেজাতে লাগলো তাইতে ধীরে ধীরে বনমালী শিকদার।

কে ঢুকলো! সত্যি—এ যে প্রমীলাকে আর চেনা যায় না। জ্বল্ জ্বল্ করছে চোখের চাহনি। ঝক্‌ঝক্ করছে নাকের হীরের নাকছাবিটা। প্রমীলার শ্রী গেছে একেবারে বদ্‌লে। দেহের সুষমায় যেন টাট্‌কা শান দেওয়া হয়েছে! সোনার গহনায় যেন দিয়েছে পালিশ। এত জৌলুস তো দেখা যায় নি—যখন প্রমীলা ছিল শ্রীনাথ ময়রার বৌ। একখানা ময়লা কাপড় প'রে ঘর-সংসারের কাজ করত'—রান্না করত'—বাসন মাজত'। কৈ—তখন তো এমন দেখি নি! সে যেন ছিল—পানায় চাপা পুকুর—দেখতে পাওয়া যেতো না জলের স্রোত। কিন্তু একি! এ যে একেবারে পদ্মদীঘি—পানার ঘোমটা গেছে স'রে—থৈ থৈ করছে জলের রাশি, ঠিক যেন গোলাপী রঙের বিলিতী মদ!

ল্যাম্পপোস্টটা এ ক'দিন দেখতে পায়নি প্রমীলাকে। এই

প্রথম দেখলে। বন্দিনীর মত অত বড় বাড়িটার মধ্যে কোথায় যে থাক্‌তো—কেমন ক'রে দেখতে পাবে তা'কে! প্রমীলার চোখে চোখ প'ড়তে ল্যাম্পপোস্টটার চোখ যেন ঝলসে গেল। শুনতে লাগলো নীরবে—কি কথা কয় দু'জনে।

জিজ্ঞেস করলে বনমালী শিকদার, কিগো—বাড়িখানা এবার কেমন হয়েছে দেখলে?

প্রমীলা বললে, বেশ—ভালো। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমায় শেষে এখানে এনে কেন তুললে? পাড়ার কেউ যদি দেখতে পায়!

জবাব দিলে বনমালী শিকদার, পায় পাবে—তাতে তোমার ভয় কি আছে?

বনমালী শিকদারের কথাটা খুবই সত্যি! ভয় কুলবধূর—কুলত্যাগিনীর আবার ভয় কি! সভয়তাই কুলবধূর গতি করে মন্থর—সুন্দর মনোরম ক'রে তোলে তার প্রকৃতি। আর নির্ভীকতাই কুলত্যাগিনীকে দেয় চপলতা--বিপদাকীর্ণ পথে জোগায় তার সাহস। সত্যি—ভয় কি! প্রমীলার আবার ভয় কিসের!

প্রমীলা বললে, যদি পাড়ার কোন মেয়েছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে?

—ভয় নেই। কেউ আসবে না। এটা জেনে রেখ', আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে বেশ—পয়সাওলা বড়লোকের ঘরে কেউ আলাপ করতে আসে না—আসে টাকা পয়সা চাইতে—কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে। তা সে-পথ আমি মেরে রেখেছি। দরোয়ানকে বলাই আছে—কাউকে বাড়িতে বিনা হুকুমে ঢুকতে দেবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারো।

প্রমীলা কেমন বায়না ধরলে—বললে, না—আমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারবো না। এ ক'দিন আমি এখানে রাত্রে

মোটে ঘুমুতে পারি নি—আমার যেন কেমন একটা অস্বস্তি ধরেছে। এর চেয়ে সেই পেনিটির বাগানবাড়ি ভালো—যেখানে প্রথম গিয়ে উঠেছিলুম।

—সে বাগানবাড়ি এখন পাবার উপায় নেই। যুদ্ধের ব্যাপারে ওটা গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিয়েছে। যুদ্ধ না থামলে, ওটা ফেরত পাওয়া যাবে না।

—না যাক্। কেন—পানাগড়ের স্টেশনের কাছে যে বাড়িতে ছ'মাস ছিলুম—সেখানে গিয়ে থাক্‌লেই তো হ'ত!

বনমালী শিকদার বললে, ওখান থেকে তো বাধ্য হয়ে তোমায় সরাতে হ'লো। আমেরিকান্ soldierরা তোমায় একদিন দেখতে পেয়ে তোমার ওপর নজর ফেলেছিল। আর কিছুদিন ওখানে থাক্‌লে, তোমায় কিছুতেই শেষ পর্য্যন্ত সামলাতে পারতুম না। বাধ্য হয়ে তাদের হাতে তোমায় তুলে দিতে হ'ত।

—সবচেয়ে ছিলুম ভালো রাঁচিতে। জায়গাটা আমার ভালোও লেগেছিল।

—বেশ তো, প্রমীলা। তোমায় রাঁচিতে আমি বাড়ি ক'রে দোব—তুমি সেইখানেই থাক্‌বে'খন। দাঁড়াও—যুদ্ধটা আগে মিটে যাক্।

প্রমীলা বললে, এ পাপ যুদ্ধ কবে মিটবে—তা তো জানি নি। কেবল ছুটোছুটি—একবার এখানে—একবার ওখানে—

বাধা দিয়ে বনমালী শিকদার বললে, এ যুদ্ধকে পাপ ব'লো না, প্রমীলা। এই যুদ্ধই আমার লক্ষ্মী। এই যুদ্ধের দৌলতেই টাকা পয়সা পেয়েছি প্রচুর—পেয়েছি তোমায়। নইলে আমরা ছ'জনে কে কোথায় থাকতুম বল'।

প্রমীলা বললে, আমি কিন্তু তোমায় ব'লে রাখছি—আমি শেষ

বয়সে কাশীবাস করবো। কাশীতেও আমায় একখানা বাড়ি ক'রে দিতে হবে—একেবারে গঙ্গার ধারে।

হেসে উত্তর দিলে বনমালী, তাই হবে। তোমার কোন্ হুকুমটা না মানা হচ্ছে—বল'।

প্রমীলার হাতখানা ধ'রে একটু কাছে টানলে বনমালী শিকদার। ল্যাম্পপোস্টটা তা দেখেছিল। এক পেগ্ মদ ঢেলে বনমালী প্রমীলার মুখের কাছে গেলাশটা ধ'রে বললে, আজ একটু খাও না, প্রমীলা।

—না—ও খেলে কেমন আমার মাথা ধরে।

—রাঁচিতে থাক্‌তে তো খেতে একটু একটু।

—ওখানে ঠাণ্ডা পড়েছিল বেশ—তাই খেতুম। এখানে আমার ও জিনিষ খাবার দরকার হবে না।

একটু পীড়াপীড়ি করতে লাগলো বনমালী শিকদার।

—তা হোক্—আজ একটু তোমায় খেতেই হবে।

জানালায় সিল্কের পরদা দেওয়া। তারির ফাঁক দিয়ে ল্যাম্পপোস্টটা দেখতে পাচ্ছিল বেশ ঘরের ভেতরটা।

হঠাৎ ব'লে উঠলো বনমালী, প্রমীলা, তুমি কিছু ভেব' না। এখানে তোমায় বেশি দিন থাক্‌তে হবে না।

জিজ্ঞেস করলে প্রমীলা, আবার কোথায় আমায় নিয়ে তাঁবু ফেলবে—শুনি।

বনমালী বললে, পানাগড়ে আর রাঁচিতে মিলিটারী ক্যাম্পে মালগুলো পাঠিয়ে দিয়ে রসিদ পেয়ে গেলেই এখন কিছুদিন ছুটি পাবো। রাঁচিতেই তো দেখলে দু' দুবার অসুখে পড়লুম। কাল ডাক্তার চৌধুরীকে একবার শরীরটা দেখাতে গেছলুম। তিনি বলেছেন—এখন কিছুদিন rest নিতে। তাই ঠিক করিছি—এই

কাজগুলো সেরেই মাসখানেক নৈনিতালে গিয়ে থাকবো তোমায় সঙ্গে নিয়ে।

প্রমীলা বললে, সেই ভালো।

পাইপে দু'একটা আলতো টান দিয়ে বনমালী শিকদার বললে, বড় মুস্কিলে পড়িছি পানাগড় ক্যাম্পের আমেরিকান সাহেব মিস্টার পামারকে নিয়ে।

জিজ্ঞেস করলে প্রমীলা, কেন ?

—সে একজন শিক্ষিত—দেখতে শুনতে ভালো—বাঙালী মেয়ে চায়। সাহেবটা যেমনি মাতাল, তেমনি লম্পট। কলকাতা থেকে কয়েকটি মেয়েকে তা'র কাছে পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু বেশিদিন তা'রা থাকতে পারলো না। সাহেবও discharge ক'রে দিলে। আমায় লিখেছে ফের—শীগ্‌গীর ব্যবস্থা করতে। নইলে আমার ত্রিশ হাজার টাকার বিলটা পাশ হবে না। দেখি—চেষ্টা করছি, শিববাবুকেও বলেছি চেষ্টা করতে।

প্রমীলা জিজ্ঞেস করলে, মিলিটারী ক্যাম্পে মেয়েছেলেও কি তোমায় পাঠাতে হয় ?

বনমালী শিকদার হেসে উঠলো। বললে, তা না হ'লে 'সাপ্লাই' বলেছে কেন ? 'সাপ্লাই' মানে সব—চাল চিনি ডাল আটা মায় মেয়েমানুষ পর্য্যন্ত।

—কোথাও জোগাড় না হ'লে শেষে আমায় ঠেলে ক্যাম্পে পাঠাবে না তো ! দেখো বাপু, আমি লেখাপড়া জানি না—শিক্ষিত নই। তোমার সাহেবকে আমি পারবো না সন্তুষ্ট করতে।

বনমালী শিকদার প্রমীলার হাতখানা ধ'রে আদরে নাড়তে নাড়তে বললে, তা কি পারি কখন', প্রমীলা। তোমায় যখন প্রথম দেখি এখানে—আমাদের পাশের বাড়িতে—তখন তো আমার বিয়ে

হয়ে গেছে; কিন্তু তা'হলেও তখন থেকেই তোমার ওপর আমার নজর পড়েছিল। কলকাতায় বোমা পড়বে—এই ভয় দেখালে সকলে। নিজের পরিবারকে ছেলে মেয়েকে সরাবার জন্মে যত না ব্যস্ত হয়েছিলুম, তার চেয়ে বেশি চঞ্চল উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম তোমায় সরাতে। হাতে টাকা আসতেই দেশের বাড়িটা আগে মেরামত ক'রে সারিয়ে তুললুম। তাড়াতাড়ি দিলুম সেখানে ছেলে মেয়ে পরিবারকে পাঠিয়ে—বোমার হাত থেকে বাঁচাবার ওজুহাতে। তারপর থেকে কেবল চিন্তায় রইলে তুমি। আমি—

বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে প্রমীলা, ছেলে মেয়ে বৌকে কি আর এ বাড়িতে আনবে না?

বনমালী বললে, কেন আনবো না—নিশ্চয় আনবো। তাদের প্রতি তো আমি অবহেলা করি নি। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্মে আমি অনেক টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি—আজও দিচ্ছি। এখনও তো যুদ্ধের গোলমাল মেটে নি—বরং আরও ঘোরালো হ'য়ে উঠছে দিন দিন। এসব থেমে থুমে যাক্—তারপর তাদের এখানে আনবো বৈ কি!

তারপর একটু হেসে বললে, প্রমীলা, নারীর সাথে পুরুষের ভালোবাসার অনেক স্তর আছে। সকল স্তরে বিয়ে-করা বৌকে নিয়ে চলা ফেরা যায় না। যারা সে-রকম চলতে পারে—তোমরা তাদের ব'লবে 'আদর্শ প্রেমিক'। কিন্তু আমি তাদের ব'লবো 'ঘোর স্ত্রৈণ'। আর যারা সে-রকম চলে না বা চলতে পারে না—আমার মতে তারাই হ'লো এ যুগের প্রকৃত রক্ত মাংসের মানুষ।

এই ব'লে বনমালী শিকদার হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। প্রমীলাকে টেনে ধরলে কাছে। হাসির কি কুৎসিৎ আওয়াজ—কি বিশ্রী ভঙ্গি! আর নয়—ল্যাম্পপোস্টটা চোখ ঘুরিয়ে নিলে ঘর থেকে।

একটি একটি ক'রে দিন কাটতে লাগলো। ল্যাম্পপোস্টটা চেয়ে থাকে বোস বাড়ির দিকে। কনকের কোন খবর আসে নি। ভাইটার জন্যে সুধার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে সে প্রকাশ করে না কিছু। পরিমলবাবু ঘরে এসে খোঁজ খবর নেয়। তাতে আনন্দ পায় সুধা। শুধু ঐটুকু—আরও বেশি কাম্য থাকলেও—সাধ্য নাই তার। সন্ধ্যার পর একটি মেয়েকে পড়াতে যায় সুধা। কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে পরিমলবাবু। পরিমলবাবুর এক বন্ধুর মেয়ে—আই-এ পরীক্ষা দেবে। ঘরের মধ্যে একলাটি ব'সে থেকে থেকে সুধা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিল। সেটা লক্ষ্য করেছিল পরিমলবাবু। কেমন যোগাযোগ এলো—পরিমলবাবু লাগিয়ে দিলে সুধাকে এই মেয়ে-পড়ানো কাজে। সুধা প্রথম রাজী হয় নি। কিন্তু ঠেলতেও পারে নি সম্পূর্ণ উপেক্ষাভরে পরিমলবাবুর কথাটা। সংসারে ঐ একটা লোকই কেমন একটু মুখপানে চায় সুধার! আর তেমন কেউ নয়। বনমালী শিকদারও চেয়েছিল। কিন্তু সুধা তেমন চাওয়া চাইলে না। বয়স্থা কুমারী মেয়েদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে অনেকেই চায়—বিশেষ ক'রে যদি তারা হয় অভিভাবকহীনা। ফুলের মালাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা যায়—আবার সাপও থাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে। শুধু কুণ্ডলীর রূপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ লুব্ধ হ'লে চলে না। দেখতে হবে কিসের কুণ্ডলী। সুধা তাই কি দেখেছিল বনমালী শিকদারের অযাচিত করুণায়! কে জানে! করুণা আর ভালোবাসায় পার্থক্য অনেকখানি। বনমালী শিকদার আর পরিমলবাবুর তফাৎ

ঢের। সুধা বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল সে তফাৎ—বুঝতে পেরেছিল বোধ হয় সে পার্থক্য!

কিন্তু ল্যাম্পপোস্টটা বলেছিল একদিন কেমন একটি ছোট্ট কথা। মনে আছে তা' আজও। ল্যাম্পপোস্টটা বলেছিল, দেখ'—করুণা কমে, ভালোবাসা বাড়ে। করুণা রগ্‌ড়ালে শেষে বিশ্রী গন্ধ বেরোয়—ঠিক যেন চট্‌কানো গাঁদালপাতার গন্ধের মত। আর প্রকৃত ভালো-বাসায় দেয় কস্তুরী-সুবাস।

কথাটা শুনে চেয়েছিলুম খানিকক্ষণ ল্যাম্পপোস্টের আলোর দিকে!

বললে অমনি ল্যাম্পপোস্টটা, ও-ও—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি কথাটা! বেশ—সাধ্য থাকে; নিজের জীবনেই সেটা যাচাই ক'রে দেখ'না, বাপু। আমি যে এইখানটিতে ঠায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর দাঁড়িয়ে যাচাই ক'রে ক'রে দেখেছি তা'। আমি তো শিখেছি, বাপু, তোমাদের কাছ থেকেই—এই পাড়ার খোলা পাঠশালে শুধু বোকার মত ব'সে ব'সে। নইলে সেদিন সন্ধ্যার পর চারু বোসের সেই বিধবা মেয়ে নলিনী মুখে পান চিবুতে চিবুতে তরুবালার ঘরে ঢুকে ব'সে অমন ক'রে কথা কইছিল কেন! ভালো-বাসার ব্যাখ্যান করছিল নলিনী। শুনছিল রুটি বেলতে বেলতে তরুবালা। ঘ্রাণশক্তি যাদের বিকৃত, তা'রা মৃগনাভিতে চাম্‌শা গন্ধ পায়। কামের আগুনে-ঝল্‌সানো দেহে পায় তা'রা সুবাস।

নলিনী বললে, বৌদি, বিশ্বাস কর'—নিজের চক্ষে দেখেছি কাল।

জিজ্ঞেস করলে তরুবালা, কি ভাই, নলিনী।

—না—আর বলব'না—থাক্। শেষে আমার ওপর তুমি রাগ করবে, বৌদি।

—না—আমি রাগ করবো না। তুই বল্ সব—আমি শুনবো।

—শুনবে তবে ?

—হ্যাঁ—শুনবো।

নলিনী বললে, কাল সন্ধের পর সুধাদি'র ঘরে উঁকি মেরে দেখি—না বৌদি—থাক্—আর বলবো না।

তরুবালা বললে একটা মৃদু ধমক দিয়ে, না—না—তুই বল্ না, নলিনী—কি দেখ্‌লি বল্ না।

—ঘরের আলো নিবোনো। উঁকি মেরে দেখি—এক বিছানার ওপর পাশাপাশি ব'সে আছে সুধাদি' আর পরিমলদা'। কি ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইছে। কি ঘেন্না—কি ঘেন্না—লজ্জায় আমারি যেন গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠছিল।

—আমি ওটা লক্ষ্য করেছি অনেকদিন, নলিনী। কিছু আর বলি নি তোর দাদাকে। লেখাপড়া-জানা পাশ-করা মেয়ে—ওদের ধরণ-ধারণ নাকি আলাদা।

—আচ্ছা তা'ব'লে—যে পুরুষমানুষের ঘরে বৌ রয়েছে—ছেলে মেয়ে রয়েছে—তা'কে নিয়ে অমন ঢলাঢলি কেন! পরের সুখের সংসারে আগুন জ্বালাতে তোর ইচ্ছে গেল শেষে! ছি-ছি—এই কি তোর শেষে লেখাপড়া শেখার রীতি-নীতি না কি! তুমি জানো না, বৌদি, সুধাদি'র মা অনেক চেষ্টা করেছিল সুধাদি'র বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সুধাদি' কিছুতেই বিয়ে করলে না। কেন—জানো ?

তরুবালা বললে, আগে জানতুম না, ভাই। এখন দেখছি, সুধা বিয়ে করলে না—সে শুধু আমার কপাল পোড়াতে।

নলিনী বললে, জানো বৌদি—সুধাদি'র মা শুধু কনকের জন্যে মরে নি। সুধাদি'ও মাকে কম জ্বালায় নি। ন্যাকাপড়া আর আমায় দেখিও না। কেন—ন্যাকাপড়া-শেখা মেয়েরা কি আর বিয়ে করছে না আজকাল! তা নয়—তা নয়—পরিমলদা'র ওপর ওর কেমন নজর

পড়েছে গোড়া থেকেই। এখন আরও সুবিধে হয়েছে—মা মরেছে—ছোট ভাইটা পালিয়েছে—একা ঘরের হর্তা কর্তা বিধাতা—যা ভালো বুঝবে—তাই করবে।

খুব আক্ষেপের সহিত তরুবালা বললে, বেশ তো—তোর দাদা থাকুক না সুধাকে নিয়ে, যদি সুখী হয়। আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি আমার ভায়ের কাছে ছেলে মেয়ের হাত ধ'রে।

নলিনী বললে, তা কেন যাবে তুমি, বৌদি! দাদার ওপর কি তোমার কোন জোর নেই?

—আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ—রয়েছি চিরকাল যেন তোর দাদার দয়ার পাত্রী হয়ে। সুধার রূপ আছে গুণ আছে—তা'কে তো ভালো লাগবেই।

নলিনী একথা সে-কথার পর উপদেশ দিলে—বললে, বৌদি, তুমি আজ আচ্ছা ক'রে দাদাকে দু'কথা শুনিয়ে দাও দেখি। দেখ'না—পরিমলদা' তোমায় কি বলে। তাহলেই বুঝতে পারবে—ওদের ভেতরের ব্যাপারটা!

তরুবালা কেমন গুম্ হয়ে রইলো।

আরও খানিকক্ষণ ব'সে গল্প ক'রে নলিনী চলে গেল নিজের কাজ সেরে। আব্ছা সন্দেহ যেটুক ছিল তরুবালার, সেটুক পরিণত হ'লো তার দৃঢ় বিশ্বাসে। পুরুষে যেমন চায় নারীকে তার নিজের সম্পত্তিরূপে—নারীও ঠিক তেমনি চায় পুরুষকে। পুরুষের তেমন চাওয়াটা মুখর—নারীর কিন্তু মৌন। বড় বড় শাস্ত্রীয় বচন নির্দ্দেশ বিধিনিষেধের বেড়া লাগিয়ে লাগিয়ে পুরুষ তার কাম্যটা একেবারে যেন ঢাক ঢোল বাজিয়ে তেত্রিশকোটি দেবতাকে জানিয়ে কায়েমী ক'রে রেখেছে। কিন্তু নারী তেমন পারে নি। পারে নি ব'লেই, যেখানে এর প্রত্যবায় দেখা যায়—সেখানে নারীর অন্তর দিবারাত্র মাথা ঠুকে

ঢুকে মরে তার ভাগ্যের দুয়ারে। আর পুরুষ পেরেছে ব'লেই—তখনি সে নারীকে ধিক্কৃত লাঞ্ছিত ও বহিষ্কৃত ক'রে দেয় তার অধিকার হ'তে।

তরুবালার মন গেল খারাপ হয়ে। ছেলে মেয়ে দু'টোকে খাইয়ে তাদের শুইয়ে পরিমলবাবুর জন্যে খাবার ঢাকা দিয়ে নিজে না খেয়ে শুয়ে পড়লো বিছানার ওপর। একটা চাপা আক্রোশ ভেতরে ভেতরে গর্জ্জাতে লাগলো তার। সুধার ওপর অজস্র গালিবর্ষণ চলতে লাগলো মনে মনে। এর একটা প্রতিবিধান সে করবে—নিশ্চিত করবে! কেন সে সহ্য করবে এতটা অপমান! চারু বোসের মেয়ে নলিনী সাক্ষী আছে। সে ডাকৃবে পাড়ার পাঁচজনকে। বলবে সে তাদের সামনে সুধার কীর্ত্তিকলা। সাপের বিষদাঁত যেমন সর্ সর্ করে—তলায় বিষের থলি পূর্ণ হ'লে পর, একটা কিছু দংশাতে না পারলে যেমন সে শান্তি পায় না—তরুবালার অবস্থা হ'লো হঠাৎ ঠিক সেই রকম। এর একটা হেস্তনেস্ত না করা পর্য্যন্ত সে কিছুতেই যেন শান্তি পাচ্ছিল না।

রাত ন'টার পর পরিমলবাবু বাড়ি ফিরলো। ফিরলো ঠিক ঐ সময় সুধাও। মোড়ের মাথায় দু'জনের দেখা হয়—একত্রে আসে তার পর। কথা কইতে কইতে আসছিল। সিঁড়ির মুখে দু'জনেই দাঁড়ালো।

পরিমলবাবু বললে, তুমি Logic টা একবার দেখ', সুধা। আমার মনে হয় ওটা fallacy নয়—ওটা valid induction।

সুধা বললে, কি ক'রে হবে, পরিমল দা'? argument টা তো—আপনার Pure hypothesis এর ওপর মোটেই দাঁড়াচ্ছে না।

পরিমলবাবু উত্তর দিলে একটু মৃদু হেসে, আচ্ছা—কাল তোমায় বোঝাবো। তুমি তার আগে বইখানা একবার দেখে রেখ'।

আর কোন কথা হ'লো না। সুধা সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, পরিমলদা', রেবার খাওয়া হয়ে গেছে?

—বোধ হয় হয়ে গেছে।

—তা'লে ওকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন ত? আজ থেকে তো আমার কাছে ও শোবে বলেছিলেন।

পরিমলবাবু বললে, দেখছি।

সুধা আর দাঁড়ালো না—ওপরে চলে গেল।

পরিমলবাবু ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে তরুবালাকে, আজ কি শরীর খারাপ নাকি তোমার—এরির মধ্যে শুয়ে পড়েছ?

কোন উত্তর দিলে না তরুবালা।

জিজ্ঞেস করলে ফের পরিমলবাবু, রেবার খাওয়া হয়ে গেছে?

তরুবালা বললে, হ্যাঁ হয়েছে—সে শুয়ে পড়েছে।

পরিমলবাবু বললে, আহাহা—আজ যে সুধাকে বলেছিলুম, রেবা ওর কাছে গিয়ে শোবে—

বাধা দিয়ে তরুবালা ব'লে উঠলো, রেবার দরকার নেই। ওখানে খাবার ঢাকা আছে—খুলে খেয়ে তুমিই বরং ওপরে সুধার কাছে গিয়ে শোওগে যাও। আর কাল তা'কে যা' বোঝাবে বলছিলে সিঁড়ির কাছে—সেটা আজ রাত্রেই তার গলা ধ'রে বুঝিয়ে দাও গে।

পরিমলবাবু বললে, দেখ'—তোমার মনটা বড় ছোট; তাই আজকাল যা মুখে আসছে, তাই বলে যাচ্ছ।

—আমি মুখ্যু সুখ্যু মেয়েমানুষ—স্থাকাপড়া জানি না—আমার মন তো ছোট হবেই। স্থাকাপড়া শিখে পাশ ক'রে যার মন গড়ের মাঠের মত চওড়া হয়ে আছে, সেইখানে গিয়ে—বেশতো—হাওয়া খাও না—কে তোমায় বারণ করছে!

মেয়েছেলের সঙ্গে নীচ ব্যাপারে তর্ক ক'রে বাহাদুরি কিনতে পরিমলবাবু চায় না। পরিমলবাবুর প্রকৃতি ছিল অন্য রকমের। সংসারে মেয়েছেলের সঙ্গ অনেকটা কষ্টিপাথরের মত—পুরুষের জ্ঞানবুদ্ধি তা'তে বেশ শান দেওয়া যায়। এরূপ যোগাযোগ যেখানে হয়, সেখানে পরস্পরের মিলন হয় মধুর। পুরুষের প্রতিভা স্ফুরিত হয় নারীর প্রেরণায়। কিন্তু তরুবালার সঙ্গলাভে পরিমলবাবুর সেরূপ কিছু হয় নি। সেটা বুঝেছিল—তাই বৃথা কথা কাটা-কাটিতে সাধারণ মানুষের মত নিজের সময় ও উদ্যম নষ্ট করত' না পরিমলবাবু। জানতো বেশ, নরনারীর মিলনে দেহের দাবিটা বড় নয়—বড় থাকে মনের দাবি। সে মনটা তিক্ততায় ভরিয়ে তুলতে পরিমলবাবু কোনও দিনই চায় নি। সে দিনও চাইল না। সুধার প্রতি তার স্নেহ—সেটা যে একটা কুৎসিৎ ভালোবাসার রূপান্তর—এটা কোনও দিন ভাবতে পারে নি পরিমলবাবু। তাই তরুবালার শ্লেষোক্তির প্রত্যুত্তরে আর কিছু না ব'লে পরিমলবাবু হাত মুখ ধুয়ে আহার করতে বসলো।

একটু পরেই সুধা এসে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, পরিমলদা', রেবা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি?

পরিমলবাবু খেতে খেতে বললে, হ্যাঁ সুধা—ও ঘুমুচ্ছে ঘুমুক—আর তুলবো না। তুমি দরজা দিয়ে শুয়ে পড়'গে।

আর দাঁড়ালো না সুধা। ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ওপরে চলে গেল। যেতে যেতে শুনতে পেলে তার পেছনে তরুবালা সশব্দে ঘরের দরজাটা

বন্ধ ক'রে দিলে। সুধার ওপর সমস্ত রাগটা তরুবালার গিয়ে পড়লো হঠাৎ ঘরের দরজাটা বন্ধ করার ওপর। বুঝতে পারে নি তা' সুধা—কিন্তু পারলে বুঝতে পরিমলবাবু।

কথাটা খুবই সত্যি—এ সংসারে যে কথা কয় না, কেবল শুনে যায়, সেই জানে বেশি ; যে কিছুই দেখায় না, কেবল দু'চোখ মেলে দেখে যায়, সেই বোঝে বেশি। ল্যাম্পপোস্টটা ঠিক ঐরকম। যেটুকু তার দেখা-শোনার বাইরে, সেটুকু সে ঠিক ঠিক ব'লে দেয়। পরে তার কথা সব মিলেও যায় ঠিক ঠিক। নইলে ক'মাস পরে ভবেশ পালিতের চাকরি গেল, ট্যাঁকশালে কি চুরি করেছিল ব'লে—আর অমনি দু'দিন পরে নলিনীর মা তা'কে বললে, ঘর ছেড়ে দিতে—এ খবরটা ল্যাম্পপোস্টটা কেমন ক'রে পেলে! কিন্তু খবরটা সত্যি। নলিনীর মা অমন ঝুনো নারকোলের কারবার করে না—তাতে তা'কে ভালোই বল' আর মন্দই বল'। ল্যাম্পপোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলুম ব্যাপারটা।

ক'মাসের ঘর-ভাড়া দিতে পারে নি ভবেশ পালিত। সেই নিয়ে নলিনীর মা একদিন দিলে আচ্ছা ক'রে দু'কথা শুনিয়ে। ভবেশ পালিত বললে, ঘর-ভাড়া এক পয়সা কারোর মেরে পালাবো না—ভয় নেই। বাপের বেটা আমি। এই মাসের মধ্যেই চাকরি পাবো। দিল্লীর সেক্রেটেরিয়েটে দরখাস্ত ক'রে দিয়েছি। শীগ্‌গির উত্তর এলো ব'লে। তখন একবার বুঝিয়ে যাবো—কত ধানে কত চাল!

নলিনীর মা বললে, ধান-চালের হিসেব আমি অত জানতে চাই না। আমার ঘর-ভাড়া মিটিয়ে তবে যাবে—নইলে ছাড়ান নেই। ঘরের জিনিষ-পত্তর আমি তালাবন্ধ ক'রে রেখে দোব—এক তিল নিয়ে যেতে দোব না কারোয়—যদ্দিন না আমার পাওনা ভাড়া আদায় হয়।

ভবেশ পালিত চালাক লোক। চাকরির নোটিশ্ হবার আগেই সে পাঠিয়ে দিয়েছে তার স্ত্রী ছেলে মেয়েকে দিল্লীতে—তার শ্বশুর মশা'য়ের কাছে। ঘরের আসবাবপত্রও কিছু সরিয়ে দিয়েছে তার বন্ধুর বাড়ি। বোস বাড়ির পাঁচজনে শুনেছে, থিয়েটার রোডে ফ্ল্যাট্ ভাড়া করেছে ভবেশ পালিত। জিনিষপত্র সেইখানেই পাঠানো হচ্ছে ধীরে ধীরে।

এক প্রকার পুরুষমানুষ আছে—তারা মেয়েদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে ঝগড়া করতে বেশ পারে এবং তা' ভালোওবাসে। অন্য পুরুষদের সঙ্গে তাদের মেলামেশা থাকে খুব কম। তাদের কারবার কেবল মেয়েদের নিয়েই—কি ঝগড়ায়, কি ভালোবাসায়। ভবেশ পালিতের প্রকৃতি ঠিক সেই রকম। নলিনীর মায়ের কথাগুলো শুনে পা গলিয়ে পেন্টুলটা প'রে কোমরে আঁটতে আঁটতে ঘর থেকে সরু বারান্দার ওপর বেরিয়ে এসে ভবেশ পালিত বললে, আচ্ছা—দেখা যাবে—আমি ভবেশ পালিত। ভবেশ পালিতের ঘরের জিনিষ কার ক্ষমতা তালাবন্ধ করে—একবার দেখবো। পুলিশ দাঁড় করিয়ে জিনিষ-পত্তর বার ক'রে নিয়ে যাবো চোখের সামনে দিয়ে। দেখি কে রোখে!

নলিনীর মা বললে, আসুক না পুলিশ—পুলিশকে ভয় করি না কি! তা'বলে কি আমার ন্যায্য ঘর-ভাড়া ফাঁকি দিয়ে যাবে মনে করেছ? সেটি হচ্ছে না।

ভবেশ পালিত বললে বেশ জোর গলায়, ভাড়া আমি অনেক দিয়েছি। আর এক পয়সা দোব না।

—দিস্ কি না দিস্ দেখা যাবে।

এই ব'লে নলিনীর মা আতুরি ঝিকে ডাকলে। বললে, আতুরি, আজ হতচ্ছাড়া মিনসেটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ঘরে বড় তালা লাগিয়ে দিবি।

আতুরি এগিয়ে এলো। নলিনীর মায়ের হয়ে বললে, এ তো ভারি অন্যায় কথা, বাপু। পাওনা টাকা দেবে না কি গো!

ভবেশ পালিত বললে, পাওনা টাকা কিছু নেই। ঘর-ভাড়া ছাড়া আমি মাস মাস যা দিয়েছি—তার হিসেব কর'।

আতুরি বুঝিয়ে দিলে হিসেব। বললে, মাস মাস যা দিয়েছ, সে তো তোমার খোরাকির টাকা গো। দিল্লীতে বৌ-ঝি পাঠিয়ে এখানে যে খেলে ক'মাস দু'বেলা—তার টাকা দেবে কে?

ভবেশ পালিত বললে, তার টাকা অত হয় না। মুদির দোকানে ধার শোধ ক'রে দিয়েছি তোমাদের, জানো। যুদ্ধের বাজারে কয়লা পাও না—আমার বন্ধুকে ধ'রে এক গাড়ি কয়লা আনিয়ে দিয়েছি—তা জানো। তা'র টাকা দিতে হয়নি আমায়? তা' ছাড়া রোজ তারিখে বাজার এনে দিয়েছি। সপ্তাহে দু'দিন মা ও মেয়েকে সিনেমা দেখিয়েছি—তার খরচ নেই?

আতুরি অমনি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো নাক সিঁটকে, আ মরণ আর কি মিনসের! কীর্ত্তিকথা বলবো না কি—পাঁচ বাড়ির লোক দাঁড় করিয়ে, হাটে হাঁড়ি ভাঙবো না কি! ভদ্দর ঘরের মেয়ে পেয়েছিলে ব'লে তাই বেঁচে গেল। আর এই আতুরি ছিল ব'লে রক্ষে—নইলে যে হাতে দড়ি পড়তো—এতদিনে যে জেলখানায় ঘানি টানতে হ'তো!

ভবেশ পালিত রুখে দাঁড়ালো। বুক ফুলিয়ে বললে, দেখ'—

আমি ভবেশ পালিত—তোমাদের মত অনেক মেয়েছেলে আমি এ জীবনে চরিয়ে এসেছি। আমায় ঘেঁটিও না—ঘরের কেলেঙ্কারি আগে সাম্‌লাও। আমি পরপুরুষ বেটাছেলে—পরোয়া করি না কারোর।

এতক্ষণ নলিনী কাছে ছিল না। চেঁচামেঁচি শুনে ছুটে এলো। মাকে ও আতুরিকে দু'হাত দিয়ে দু'দিকে সরিয়ে আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে ভবেশ পালিতের সাম্‌নে এগিয়ে গিয়ে বললে, ঘরের কেলেঙ্কারিটা কি শুনি! যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা! বলে—'ভাত কাপড়ের নামটি নেই—কিল মারবার গোঁসাই'। বে-আক্কেলে মানুষ কোথাকার! চোখের ইসারা কর'—কলঘরে গেলে ওপর থেকে উঁকিঝুঁকি মারো—এ সব কি জানি নি আমরা কিছু? সেদিন অন্ধকার সিঁড়িতে নামতে নামতে হাত ধ'রে আমায় টেনেছিল কে? কিছু বলি নি এতদিন—তাই—

রাগের মাথায় ভবেশ পালিত চেঁচিয়ে উঠলো, নলিনী—নলিনী—

নলিনী বললে, খবরদার আমার নাম ধ'রে ডাক্‌বে না। আমি তেমন মেয়ে নই।

সত্যি—নলিনী তেমন মেয়ে নয়। নলিনী যে কেমন মেয়ে—তা নলিনী নিজেই জানে না।

তারপর তিনজনে বাক্যবাণে আক্রমণ করলে ভবেশ পালিতকে। আর যুঝতে পারলে না ভবেশ পালিত। শেষে কথা দিলে, সাত দিনের মধ্যে ঘর-ভাড়া সব মিটিয়ে সে চলে যাবে ঘর ছেড়ে—এখানে আর থাক্‌বে না।

এই পর্য্যন্ত সেদিন শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ল্যাম্পপোস্টটা জিজ্ঞেস করলে, কি ভাবছো? পৃথিবীটা স'রে যাচ্ছে কি না পায়ের তলা থেকে—তাই কি দেখ্‌ছো? ভয় নেই। সেদিনও যখন মাটি স'রে যায় নি—আজও যাচ্ছে না—কোনওদিন যাবেও না তা'।

হায় রে, তেমন স'রে গেলে, আমিই বা এদ্দিন কোথায় থাক্‌তুম—আর তুমিই বা এদ্দিন কোথায় থাক্‌তে! এস'—স'রে এস' কাছে—আমার গায়ে একটু ঠেস দিয়ে দাঁড়াও দেখি। কেমন ইচ্ছে যায় আজকাল মাঝে মাঝে—মানুষকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু হাত আর আমার ওঠে না। দেখে শুনে কেমন যেন দিন দিন অবশ হয়ে আসছে আমার সব। হা ভগবান্—এর চেয়ে আমায় যদি কানা ক'রে রাখতে সংসারে! অন্ধ—অন্ধ—কানা—কানা—দাঁড়াও—দাঁড়াও—

এ কি—কি হ'লো। ল্যাম্পপোস্টটা অমন চঞ্চল অস্থির হয়ে উঠলো কেন? কোনদিন তো এমন হয় না। আবার কারোর কথা মনে পড়েছে বুঝি! কৈ—কিছু বললে না তো আর! অমন চমকে সেদিন থেমে গেল কেন—বুঝতে পারলুম না। পরের দিন আবার আরম্ভ করলে।

সাত দিন কাটলো। কিন্তু ঘর ছাড়লে না ভবেশ পালিত। এরির মধ্যে ল্যাম্পপোস্টের কাছে আলাপ হ'লো ভবেশ পালিতের শিবপদবাবুর সঙ্গে। কথায় কথায় বুঝতে পারলেন শিবপদবাবু, ভবেশ পালিত বেকার—কাজকর্ম্ম একটা তেমন পেলে সে করে। দরকারও ছিল একটা লোকের। বনমালী শিকদারের সঙ্গে কথা হ'লো। কাজ পেলে ভবেশ পালিত। বনমালী শিকদার মাইনে দিলে মোটা। ভবেশ পালিত নবীন উদ্যমে লেগে গেল কাজে। দিন দশেক এখানে ছিল না। পানাগড় হয়ে ভবেশ পালিতকে রাঁচি যেতে হয়েছিল। ফিরে এলো কাজ সেরে। আমূল কেতা

দিলে বদ্‌লে। সাহেব-সুবোর কাছে যাতায়াত করতে হয়—নতুন স্যুট্ করালে তিনটে। এসেই নলিনীর মায়ের হাতে দু'মাসের মিটিয়ে দিলে ভাড়া। ভাড়ার টাকা হাতে নিয়ে নলিনীর মা চাইলে আতুরির দিকে—আতুরি চাইলে নলিনীর পানে। আর নারকোল ঝুনো নেই—শাঁসে জলে এখন বেশ ডগমগ! কারবারে মন দিলে নলিনীর মা।

সকাল বেলা—ভবেশ পালিত স্যুট্ প'রে বেরিয়ে যাচ্ছিল কাজে। জরুরি কাজ। বনমালী শিকদারের নিজের মটর এসে দাঁড়িয়ে আছে। ভবেশ পালিত যাবে পানাগড়ে সেই মটর চেপে। আবার তক্ষুনি আসবে ফিরে পামার সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে। নির্দ্দেশ আছে বনমালী শিকদারের। এ ব্যাপারে বেশ করিতকর্ম্মা লোক ভবেশ পালিত। বনমালী শিকদার বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে তা'র কাজে। এমন সময় নলিনী ঘরে ঢুকলো হাতে তৈরি-চা ও এক প্লেট জল-খাবার নিয়ে। চমকে উঠলো ভবেশ পালিত—এ কি!

নলিনী মুচ্‌কি হেসে বললে, মা পাঠিয়ে দিলে—কিছু না খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছ দেখে। আর আজ থেকে আমাদের কাছেই খাবে—মা ব'লে দিয়েছে।

ভবেশ পালিত উত্তরে কি বলবে ভেবেই পায় না।

নলিনীর মা এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। বললে বেশ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে, খেয়ে নিয়ে বেরিও, বাবা। আহা, বেটাছেলে—পুরুষ মানুষ—না খেয়ে না দেয়ে অমন কাজে ছুটোছুটি ক'রছ দেখে বড় কষ্ট হয় আমাদের। হাজার হোক্—আমাদের মেয়েছেলের প্রাণ, তাই থাক্‌তে পারলুম না আর। নলিনী বললে—'মা, তুমি জলখাবার তৈরি ক'রে দাও, আমি নিজে হাতে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।' খেয়ে নাও বাবা—আর হাঁড়িতে চাল নিয়েছি, আজ থেকে—বৌমা যদ্দিন না আসে—

বাধা দিয়ে ভবেশ পালিত বললে, আমি আজ কখন ফিরবো তা তো ঠিক নেই।

নলিনীর মা বললে, তা হোক—যখনই ফেরো, বাবা—তোমার ভাত গরম থাকবে।

এই ব'লে নলিনীর মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দিয়ে গেল যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ—ভবেশ পালিত ও নলিনীর পরস্পরের মান-অভিমানের পালা শেষ করবার।

ভবেশ পালিত বললে, নলিনী, তোমরা মায়ে-ঝিয়ে হঠাৎ বদলে গেলে যে দেখ্‌ছি।

নলিনী সারা মুখে একটু হাসির আমেজ মাখিয়ে বললে, তোমরা তো কেবল বাইরেটা দেখ—মেয়েদের ভেতরটা তো দেখতে পাও না।

—তা বটে।

নলিনী ভবেশ পালিতের সামনে টি'পয়ের ওপর চা খাবার সাজিয়ে এগিয়ে দিলে। ভবেশ পালিত আর বাক্যব্যয় না ক'রে খেয়ে যেতে লাগলো নির্বিচারে।

ছেঁড়া দড়িতে গেঁট পড়লো আবার। শক্ত হলো আরও দড়ির দৃঢ়তা। ভবেশ পালিত ভুলে গেল সব—ভুলে গেল পূর্ব্বের অপমান। উপযুক্ত বিধবা মেয়ের রূপ-যৌবন দিয়ে যদি লালসাতুর পুরুষকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো যায়—

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ থামিয়ে দিলে ল্যাম্পপোস্টটা। আরম্ভ করলে অন্য কাহিনী। তুললে পটলবাবুর কথা। নতুন ভাড়াটে এলো বোস বাড়িতে—আর এক শরিকের অধীনে। কি মিশুকে লোকই না ছিল পটলবাবু! হালসীবাগান থেকে উঠে এলো এ পাড়ায়। বিধবা মা নিজের স্ত্রী ও একটি বছর সাতেকের ছেলে নিয়ে পটলবাবুর সংসার। এক সপ্তাহের মধ্যেই পাড়ার সকল লোকের সঙ্গে আলাপ

জমিয়ে ফেললে। কেবল বনমালী শিকদারের সঙ্গে পারে নি। দরোয়ান ঢুকতে দেয় নি পটলবাবুকে বাড়ির মধ্যে। তাতে কোন বিকার নেই—মান অপমান যেন সমান হয়ে গেছে পটলবাবুর। কি একটা অফিসে চাকরি করে। আমুদে লোক ছিল খুব পটলবাবু। হাসিটি মুখে যেন সদা সর্ব্বদা লেগেই থাক্‌তো।

একদিন ছোট ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে সুধার সঙ্গে আলাপ করতে এলো। পরিমলবাবুর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়ে গেছে। সুধা শুনেছিল পটলবাবুর নাম—পরিমলবাবুর মুখে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলের হাত ধ'রে পটলবাবু ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে, দিদি—দিদি—

ঘরের ভেতর থেকে সুধা জিজ্ঞেস করলে, কে ?

—আমি পটল। আমায় আপনি চিনবেন না। একবার দয়া ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন।

সুধা বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো ঘর থেকে।

পটলবাবু অমনি বললে ছেলেটিকে, যাও—তোমার পিসি হয়—পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর'।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে সুধার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

'থাক্—থাক্'—ব'লে সুধা ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে ধরলে।

পটলবাবু বললে, দিদি—আজ পাঁচ দিন হ'লো এ পাড়ায় বাসা করেছি—এই আপনাদের বোস বাড়িতে। সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—কেবল আপনার সঙ্গে বাকি ছিল—তাই সেরে যাচ্ছি। হয়তো মাঝে মাঝে ছেলেটা বৌটা এসে আপনাকে জ্বালাবে—আগে থাকতে তাই আমি মাপ চেয়ে রাখছি, দিদি—যেন বিরক্ত হবেন না তাতে।

সুধা অমনি বললে, সে কি—মানুষের কাছে মানুষ আসবে—তাতে বিরক্ত হব' কেন ! আসুন—আমার ঘরের মধ্যে এসে বসুন।

সুধা খাতির অভ্যর্থনা করলে পটলবাবুকে। আদর করলে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে। পটলবাবু একটু ব'সে চলে গেল সেদিন। যাবার সময় কেমন যেন একটু মিষ্টি পরশ রেখে গেল ঘরে। পটলবাবুর কথায় বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে সুধা সত্যিই মুগ্ধ হ'লো। পটলবাবুর ছোট ছেলেটিকে ব'লে দিলে সুধা—তা'র মাকে নিয়ে একদিন আসতে।

পটলবাবুর প্রাণ ছিল ঠিক যেন একটা ফুটন্ত ফুলের মত। তাই হঠাৎ একদিন ফুলের মত ঝ'রেও গেল। মাত্র দশ দিন এসেছিল এ পাড়ায়। এই দশ দিনেই কেমন স্থায়ী রেখাপাত ক'রে গেছলো সকলের বুকে। যখন চলে গেল—সকলের চোখ ছলছলিয়ে উঠলো। ল্যাম্পপোস্টটার মনে হয়েছিল—ঠিক যেন একটা সর্ব্বনাশা ঝড়ের মুখে ছুটে এসেছিল পটলবাবু—আবার যেন জগৎ থেকে বেরিয়ে গেল তেমনি এক ঝড়ের মুখে হাসতে হাসতে !

আহিরীটোলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করতে গেছলো পটলবাবু। প্রতি রবিবারে যেতো। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে স্নান সারছিল। হঠাৎ একটা 'গেল-গেল' রব উঠলো। পটলবাবু চোখের সামনে দেখতে পেলে, একটা ছেলে ডুবে যাচ্ছে। হাকুঁপাঁকু করছে ছেলেটা অথই জলে। ওদিকে ঠিক সেই সময় গঙ্গার বুকে ষাঁড়াষাঁড়ি বান আসছে। সামাল সামাল রব চারিধারে ! কে কাকে দেখে—সবাই উঠে পড়েছে তাড়াতাড়ি জল থেকে প্রাণের ভয়ে। পটলবাবু সাঁতার জানতো না। কিন্তু জলমগ্ন ছেলেটাকে রক্ষে করতে অন্তরের এক স্বাভাবিক তাগিদে পটলবাবু এগিয়ে ধরতে গেল ছেলেটাকে। সঙ্গে সঙ্গে বানের জলে ফুলে উঠলো মা গঙ্গার বুক। তলিয়ে গেল

পটলবাবু। কিন্তু এমন বিধির নির্বন্ধ—বানের তোড়ে জলের স্রোতের ধাক্কায় সেই ডুবন্ত ছেলেটা একেবারে আছড়ে পড়লো জল-জ্যান্ত—ডাঙার ওপর। পাঁচজনে ধ'রে ফেললে ছেলেটাকে। পটলবাবুকে আর ধরতে পারলে না কেউ। শুভ্র ফেনিল উর্ম্মিমালায় মা গঙ্গার বুকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল পটলবাবুকে—তার হদিস আর তখন কেউ কিছু পেলে না। হায়-হায় করতে লাগলো সকলে তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল দুপুর থেকেই। পরিমলবাবু ছুটোছুটি করতে লাগলো পটলবাবুর সন্ধান বার করতে। আর সন্ধান! বেলা তিনটে নাগাদ পটলবাবুর মৃতদেহটা পাওয়া গেল বাগবাজার বিচুলিঘাটার জেটির পাশে।

এ মর্ম্মন্তুদ ব্যাপারে পটলবাবুর মা হা-হা ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে চলেছিল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে—এই ল্যাম্পপোস্টটার সাম্‌নে দিয়েই। কেউ তাকে ধ'রে রাখতে পারছিল না। সন্ধ্যা সবে মাত্র হয়েছে তখন। সুধা আর স্থির থাকতে পারলে না। তা'র দু'চোখ্ দিয়েও কেমন জল গড়াতে লাগলো। তাড়াতাড়ি নেমে এলো ওপর থেকে ল্যাম্পপোস্টটার কাছে। পটল-বাবুর মায়ের ডান হাতখানা ধ'রে ডাকলে, মাসিমা—

ব্যাস্—আর কিছু বলতে পারলে না সুধা। কণ্ঠ তার রুদ্ধ হ'য়ে এলো। দেখলে চেয়ে—পটলবাবুর স্ত্রী আলুথালু বেশে নিজেকে অসম্ভব রকম সবলে সাম্‌লে ধীরে ধীরে পটলবাবুর মায়ের বাঁ হাতখানা ধ'রে বলছে, মা—মা—ঘরে ফিরে আসুন, ঘরে ফিরে আসুন। আর অমন ক'রে কাঁদবেন না—চুপ করুন।

সে কি মর্ম্মভেদী দৃশ্য! চোখ চেয়ে দেখা যায় না আর! পতিহারা নারী পুত্রহারা মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে! ঘরে ফিরিয়ে আনছে শোকসন্তপ্তাকে শোকবিধুরা!

দেখেছি—এইখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। ভগবানকে দেখি নি—কিন্তু দেখেছি তাঁর সংসার ; দেখেছি সংসারের নরনারী। পটলবাবুর যেন জমি কেনা ছিল এইখানে। এইখানে মরবার জন্যেই যেন বাসা বদল করেছিল। পটলবাবু মারা গেল—ঠিক যেন একটা তাজা সুগন্ধি ফুটন্ত ফুল একেবারে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঠিকরে পড়লো ! ওদিকে বোস বাড়ির দিকে চাইছ কি। নেই—নেই—তা'রা কেউ নেই আর এখানে। পটলবাবুর মা বৌ ছেলে—চলে গেল তারপরই এখান থেকে তাদের দেশে বারাসাতে।

সেই একদিনের একটুখানি আলাপ। 'দিদি' ব'লে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল হাসিমুখে পটলবাবু। সুধা আজও ভুলতে পারে নি। তা'র হৃদয়পাতে পটলবাবু স্নেহ-প্রীতির মৃগনাভির পরশ সেই একবার আলতো এক টানে যেটুক দিয়ে গেল—তাইতে আজও রইলো সেখানটা সৌরভে ভরপুর হ'য়ে !

একটু থেমে যেন দম নিয়ে ল্যাম্পপোস্টটা বলতে লাগলো আবার, দেখ'—মনে হয় এক একটা লোক যেন কেমন ভুল ক'রে এ সংসারে এসে পড়ে। তাদের আসবার কথা নয় এখানে। তবু তা'রা এসে পড়ে। বুকে ধ'রে তা'রা নিয়ে আসে একটা স্বর্গীয় সুবাস—প্রাণে ব'য়ে আনে একটা দিব্য আনন্দের হিল্লোল। যে পথ দিয়ে যায়—সে পথে ছড়িয়ে যায় একটা স্বচ্ছ সরল হাসি। তারপর যখন তাদের ভুল ভাঙে—তখন তা'রা এমনি ক'রে হঠাৎই স'রে পড়ে। পেছনে তাকায় না কারোর। মৃত্যুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কিছু ভুলে। তাদের আয়ু হয় ক্ষণস্থায়ী। যাবার পর একটা রেখা তাদের ফুটে ওঠে মাটির বুকে—ঠিক যেন কষ্টিপাথরে সোনার দাগের মত। ঝক্‌মক্ করতে থাকে তা' বেশ কিছু কাল ধ'রে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বাসন্তী রঙে বুকের ভেতরটা তা'রা রাঙিয়ে দিয়ে যায়

সকলের। বলতে পারো—তা'রা এখানে আসে কেন ? কেন তাদের অমন ভুল হয় ? মানুষ তো তা'রা নয়! আমার এ প্রশ্ন আমি আজও বুকের মধ্যে ধ'রে আছি। জিজ্ঞেস করেছি উষার আকাশকে —জিজ্ঞেস করেছি দখিন বাতাসকে; কিন্তু উত্তর পাই নি কোন। নিজের মনে মনে ভেবে উত্তর একটা দাঁড় করাই। ঠিক হয় কি না জানি না। ভাবি—এই হিংসা-দ্বেষ-ক্লেদ-গ্লানি-ভরা জগৎ-সংসারে পরিপূর্ণ জমাট আঁধারের মাঝে অমন এক একটা চকিত আলোর বাণ যদি ছিটকে না আসে—তা'হলে বোধ হয় মানুষ বাঁচতেই পারে না। কণ্টকসঙ্কুল পথে ঘোর অমানিশার রাতে কালো মেঘের কোলে মাঝে মাঝে এক একবার বিজলী যদি না চমকায়, পথিক চলবে কেমন ক'রে! ও যে চিরন্তন ক্ষুধার মুখে একটুখানি সুধার অকিঞ্চন আস্বাদ! পেট পুরে খাবার ও যে নয়! ওরা যে মনের খোরাক— ওরা ত দেহের খোরাক নয়! মানুষের ভালোবাসার ময়লা ওরা যে ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। ওরা যে ক্ষণিকের—ওরা যে তৃষিতের। ওরা যে অমরার—ওরা যে অ-ধরার! তাই না!

ঐ দেখ'—কুঞ্জমাতালকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিচ্ছে দরোয়ান। বনমালী শিকদার ওপর থেকে হুকুম দিয়েছে—নিকাল দেও! পাড়ার কুঞ্জমাতাল—ওরা বনেদী মাতাল—তিন পুরুষ ধ'রে মদ খেয়ে আসছে। ঠাকুদ্দা জমি জায়গা বেচে মদ খেয়েছে। বাপ মদ খেয়েছে বাড়ি-ঘর বাঁধা দিয়ে। এখন কুঞ্জ বসত বাড়িখানার একটা দিকে থাকে—আর সবটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। তাইতে কোনও

রকমে নিজেকে সাম্‌লে-সুম্‌লে চল্‌ছে ; কিন্তু পুরুষানুক্রমিক পান-অভ্যাসটা ছাড়তে পারে নি। ওটা ছাড়লে কুঞ্জর কুঞ্জত্বই গেল। সে ও পারবে না। পারতে বললেও শুনবে না।

একদিন ছিল যখন বনমালী শিকদার কুঞ্জমাতালের সঙ্গে উঠতো বসতো ঘুরতো ফিরতো। তখন বনমালী শিকদারের পয়সা হয় নি। মোড়ের মাথায় বাড়ি হাঁকড়ায় নি অমন। কুঞ্জমাতালের পয়সায় অনেক মদ খেয়েছে বনমালী শিকদার। সে-কথা সে আজ ভুলে গেছে। না—না—বনমালী শিকদার কি ভুলেছে! পয়সাই তা'কে ভুলিয়ে দিয়েছে—স্ত্রী যেমন ভুলিয়ে দেয় স্বামীর মনে ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃস্নেহ একান্নবর্ত্তী সংসারে!

সময়টা বড় খারাপ পড়লো কুঞ্জমাতালের! বিলিতী মদ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও দাম যা'—নাগাল পায় না কুঞ্জমাতাল। অনেক দিন দেখা পায় নি বনমালী শিকদারের। কেমন ইচ্ছে গেল সেদিন—দেখা করতে এলো কুঞ্জমাতাল। এক গেলাসের বন্ধু—নিশ্চয় তা'রে পেয়ার করবে—বিলিতী মদ এক বোতল দেবে নিশ্চিত খেতে। তাই গেছলো বনমালী শিকদারের বাড়ি। অতটা বুঝতে পারে নি যে, এখন খাতির ক'রে কথা কইতে হবে বনমালীর সঙ্গে। তাই বাড়িতে ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো কুঞ্জমাতাল, কৈ হে—কোথায়—বনমালী—বনমালী—ওপরে আছো না কি!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলো তর্‌তর্‌ ক'রে কুঞ্জ। পরণে একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড়—গায়ে একটা তেলচট্ গেঞ্জি।

হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এলো দরোয়ান। সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে হুকুম দিলে বনমালী শিকদার একবার নীচের দিকে চেয়ে—নিকাল দেও।

কুঞ্জমাতাল বললে তবু, বনমালী—আমি—আমি কুঞ্জ—কুঞ্জ—

সে কথার জবাব দিলে না বনমালী শিকদার। জ্বলন্ত পাইপটা হাতে ধ'রে বেশ শানানো গলায় বনমালী ডাকলে, দরোয়ান—

—হুজুর।

—কাহে ঘুস্‌নে দিয়া মাতোয়ারা আদমিকো? শালা উল্লুক কাঁহাকা!

ব্যাস্‌—আর কোন কথা নয়। বনমালী শিকদার ঘরে ঢুকলো। দরোয়ান মনিবের গাল খেয়ে সমস্ত রাগটা চাপালে কুঞ্জমাতালের ঘাড়ের ওপর। ধাক্কা দিতে দিতে বার ক'রে দিলে বাড়ি থেকে।

কুঞ্জমাতাল আর কিছু বললে না। চলে গেল সেদিন মুখটি বুজে। ভুলটা নিজের হয়তো বুঝতে পেরেছিল পরে। বনমালী শিকদারের এখন সম্মান কত! পাড়ার মধ্যে অমন পয়সাওলা আর কে আছে! কাঞ্চন-কৌলিন্যে সে তো এখন একটা মানুষের মত মানুষ! মর্য্যাদা তার পদে পদে! আর কোথাকার কুঞ্জমাতাল—সে এসে চেঁচিয়ে ডাকছে কি না তা'র নাম ধ'রে—বনমালী—বনমালী—আরে ছি-ছি!

তিন দিন বাদ একদিন সন্ধ্যার পর এই রাত আটটা ন'টার সময় কুঞ্জমাতাল কোত্থেকে টলতে টলতে এসে দাঁড়ালো এই ল্যাম্প-পোস্টটার পাশে। বাঁ হাতের তেলোর ওপর একটা জ্যান্ত মুরগীর ছানা বসিয়ে ডান হাত দিয়ে তা'র গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে কুঞ্জমাতাল বেশ চেঁচিয়ে বলতে লাগলো। বলো, বাবা বলো রামনাম বলো। 'হরেকেষ্ট রামনাম বলো, বাবা—রামনাম বলো।

দেখতে দেখতে পাড়ার লোক জড় হ'তে লাগলো ল্যাম্পপোস্টটার চারিধারে কুঞ্জমাতালকে ঘিরে। কুঞ্জমাতালের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আপন মনে নেশার খেয়ালে মুরগীর ছানার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর পাখী-পড়ান পড়িয়ে যাচ্ছে। বলছে, বলো বাবা বলো—'রামনাম' বলো। হরেকেষ্ট—রামনাম বলো, বাবা—রামনাম বলো।

কে একজন জিজ্ঞেস ক'রে উঠলো ভিড়ের মধ্য থেকে কুঞ্জমাতালকে, বলি ও কুঞ্জ—ও কি হচ্ছে? ওটা যে মুরগীর ছানা—মুরগী কখনো 'রামনাম' বলে?

কুঞ্জমাতাল অমনি বললে, কেন বলবে না—আলবৎ বলবে—ওর বাপ চোদ্দ পুরুষ 'রামনাম' বলবে।

—তা কি কখন' হয়?

কুঞ্জমাতাল বললে, কেন হয় না? বনমালী শিকদার যদি পয়সা ক'রে 'বাবু' হ'তে পারে, বাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে যদি 'নবাব' বোনতে পারে—তা'হলে মুরগীর বাচ্ছাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে এলুম—কেন ও 'রামনাম' বলতে পারবে না? আলবৎ বলবে—ওর বাপ চোদ্দপুরুষ বলবে—চালাকি! বলো বাবা বলো—'রামনাম' বলো, বাবা—'রামনাম' বলো।

'কোঁকর-কোঁ' ক'রে ডেকে উঠলো মুরগীর ছানাটা।

হেসে উঠলো হো-হো ক'রে উপস্থিত সকলে।

কুঞ্জমাতাল নড়লো না। প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে সমানে নেশার ঝোঁকে পাখীর বদলে পড়াতে লাগলো রামপাখী—বাঁ হাতের তেলোর ওপর বসিয়ে ডান হাত গায়ে তা'র বুলুতে বুলুতে।

রাস্তার ধারের দোতলা ঘরের খোলা জানলা ক'টা নিজ হাতে বন্ধ ক'রে দিলে বনমালী শিকদার—'যত্তো সব মাতালের কাণ্ড' ব'লে।

সন্ধ্যে হ'লো। শাঁখ বাজলো ঘরে ঘরে। ল্যাম্পপোষ্টের মাথায় আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে অনেক আগে। চেয়ে আছে বোস বাড়ির দিকে। দেখলে, নলিনী এসে ঢুকলো তরুবালার ঘরে। রান্নার জোগাড় নিয়ে বসছে তরুবালা। তিনটের শো'তে সিনেমা দেখে এসেছে। হিন্দী বই—বেশ লেগেছে তরুবালার। আজকাল নলিনী এলে তার সাথে সিনেমার গল্প করে। সমালোচনা করে—অভিনয়ের খুঁদ ধরে। এ ব্যাপারে বেশ তৈরি হয়েছে তরুবালা। আর হবে না! সিনেমা-দেখা কোন্ ছেলে মেয়ে আর অ-তৈরি রইলো!

নলিনী ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে, কি বৌদি—কি করছো?

তরুবালা বললে, কি রে নলিনী—তুই কোথায় ছিলি এ ক'দিন? তোর যে আর দেখাই পাই নি।

নলিনী বললে, বৌদি—চারদিন এখানে ছিলুম না।

—কোথায় গেছলি রে?

—বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলা ঠাকুর দেখতে।

—কার সঙ্গে গেছলি?

—আতুরির সঙ্গে। ভবেশবাবু মটরে ক'রে নিয়ে গেছলো। আমাদের আতুরির দেশ যে বর্দ্ধমানে। অনেক দিন ওদের দেশে একবার বেড়াতে যাবো যাবো করছিলুম—এবারে সেরে এলুম।

—বেশ—আর কোথায় কোথায় গেছলি?

—ভবেশবাবু মটরে ক'রে পানাগড়ে নিয়ে গেল।

—কেন রে—পানাগড়ে কোন্ ঠাকুর আছে?

—পানাগড়ে আবার ঠাকুর কোথা! ওখানে তো মিলিটারী ছাউনি রয়েছে কেবল। সৈন্য-সামন্তরা সব আসা যাওয়া করছে—দেখলুম।

গালে হাত দিয়ে তরুবালা ব'লে উঠ্‌লো, ও মাগো—তোর তো সাহস খুব, নলিনী! আমি হ'লে এক্কেবারে ভয়ে মরে যেতুম।

নলিনী হেসে বললে, ভয় আবার কিসের! তা'রাও মানুষ—আমরাও মানুষ। তা' ছাড়া ভবেশবাবু সঙ্গে ছিল ব'লে—আরও জোর পেলুম। এই নাও—তোমার ছেলে মেয়ের জন্যে চক্‌লেট এনেছি ভালো। ওখানে একজন বড় সাহেব আছে—তার নাম পামার সাহেব। খুব ভদ্দর লোক। ভবেশবাবুকে খুব খাতির করলে। নিজে এসে—মটরের মধ্যে আমরা ব'সে আছি—আমাদের প্যাকেট প্যাকেট চক্‌লেট, বিস্কুট, স্যাণ্ডউইচ্, কেক্—কত কি খেতে দিলে। কত আর খাবো বলো। তাই নিয়ে এলুম তোমার ছেলে মেয়ের জন্যে।

তরুবালার ছেলে মেয়েরা তখন ঘরে ছিল না। বাইরে রোয়াকে ব'সে অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছিল। থাক্‌লে—তৎক্ষণাৎ চক্‌লেটের বায়না ধরতো। তরুবালা সরিয়ে রাখলে চক্‌লেটের প্যাকেটটা। বললে, থাক্ এখন। ওদের পরে দোব'খন।

—ফেরবার সময় ভারি মজা হ'লো, বৌদি!

—কি হ'লো রে।

—ভবেশবাবু মটরে ক'রে ত্রিবেণীর ঘাটে নিয়ে এলো। সেখানে আমরা গঙ্গাস্নান করলুম। তারপর বাঁশবেড়েতে হংসেশ্বরী ঠাকুর দেখে—এই বিকেলবেলা বাড়ি ফিরলুম। তুমি যদি থাকতে সঙ্গে, বৌদি, খুব আনন্দ হ'তো।

অমনি অভিমানের সুরে ব'লে উঠ্‌লো তরুবালা, আমি একেবারে নিমতলায় যাবো, নলিনী—তার আগে আর কোথাও যেতে হবে না।

আজ তিনমাস তোর দাদাকে বলছি—একবার তারকেশ্বরে ঘুরিয়ে আনো না। তা আমার কথা গ্রাহ্যই করছে না। একটু জোর করলে বলে—'আমার সময় নেই। তুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘুরে এস' না।' আচ্ছা—বল্‌তো, নলিনী—আমি একা মেয়ে মানুষ—অদ্দুর পারি ছেলে মেয়ে নিয়ে যেতে আসতে।

চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলে নলিনী, হ্যাঁগা বৌদি, দাদাকে বলেছিলে না কি কোন কথা—সুধাদি'র সম্বন্ধে?

—ঢের বলেছি রে, ভাই, ঢের বলেছি। কিন্তু কি আর বলবো তোরে—চোরা না শোনে ধম্মের কাহিনী। আমায় বলে কি জানিস্ —আমার ছোট মন—তাই ঐসব সন্দেহ করি।

—তা তো বলবে এখন। চোরকে হাতে নাতে ধরতে পারলেই বলে, চুরি করি নি তো—হাত দিয়ে দেখছিলুম। আচ্ছা—বৌদি, জিজ্ঞেস করি—রোজ সন্ধের পর দাদা আর সুধাদি' যায় কোথায়?

—চুলোয় যায়—চুলোয় যায়। জিজ্ঞেস করলে বলে, ছেলে পড়াতে গেছলুম।

নলিনী বেশ মাতব্বরী সব-জান্‌তা চালে বলতে লাগলো ঘাড় নেড়ে নেড়ে, হুঁঃ—ছেলে পড়ানো—আমরা যেন কিছু জানি না—ন্যাকা!

কৌতূহলবশে তরুবালা জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যায় ওরা দু'জনে একসঙ্গে, তুই জানিস বুঝি, নলিনী?

নলিনী বললে, জানি, বৌদি—কিন্তু আজ আর বলবো না। তোমায় একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দোব'খন জায়গাটা।

একটা চাপা ঈর্ষার আমেজ চোখে মুখে ফুটে উঠলো তরুবালার। নির্বাকে চেয়ে রইলো নলিনীর মুখের দিকে—আরও কিছু যেন এ ব্যাপারের শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে।

নলিনী বললে, ভবেশবাবু কিছুদিন আগেই আমায় বলেছিল একদিন—মটরে ক'রে গড়েরমাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেয়েছিল, দাদা ও সুধাদি' পাশাপাশি ব'সে গল্প করছিল মাঠে। ছেলে পড়ানোই বটে!

—সত্যি?

—হ্যাঁ, বৌদি—সত্যি। মাইরি বলছি। যদি বলো তো—এ কথা ভবেশবাবুকে ডেকে ভজিয়ে দিতে পারি।

তরুবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে নলিনীকে, আজ সে এর একটা হেস্ত-নেস্ত করবে। আর সে সহ্য করতে পারবে না—অনেক করেছে। ছেলে মেয়ের বাপ হয়ে—ছি-ছি! তা ছাড়া সুধার মা মারা যাবার পর থেকেই লক্ষ্য করছি—টাকা পয়সাও আর আমার হাতে বড় দেয় না। বুঝতে পারছি—যা' উপায়, তার বারো আনা ঐ সুধার পায়ে ঢেলে দিয়ে ঘরে ঢুকছেন। ছি-ছি—এরির নাম ন্যাকাপড়া শেখা! আজ তোর দাদা আসুক ঘরে—রোজ সন্ধের পর ছেলে পড়াতে যাওয়া বার করছি!

সত্যি—সেদিন রাত্রে তরুবালা একেবারে কোমর বেঁধে যেন রুখে দাঁড়ালো। পরিমলবাবুর এ অনাচার সে আর কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

রাত্রে আহার সেরে পরিমলবাবু একখানা বই খুলে পড়তে বসলো আলো জ্বেলে। তরুবালা অমনি গর্জ্জে উঠলো, ঘরের আলো নেবাবে তো নেবাও—আজ চার রাত্রি আমার ঘুম নেই—ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে; নইলে কাল সকালে যদি না তোমার বই-খাতাপত্তর উনুনে জ্বালিয়ে দিই তো—আমি বাপের বেটী নই।

পরিমলবাবু সহাস মুখে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলে, কি—হ'লো

কি তোমার? আজ চার রাত্রি ঘুমুতে পাচ্ছ না কেন? কোন অসুখ বিসুখ নয় তো? কি—হয়েছে কি?

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো তরুবালা, কিছু হয় নি—আমায় জাত সাপে কেটেছে।

পরিহাস ক'রে বললে পরিমলবাবু, তাই না কি—তাহলে তো তোমায় বাঁচাবার জন্যে এক্ষুনি একজন ভাল সাপের ওঝা ডেকে নিয়ে আসতে হয়।

—আর ঢঙ্ ক'রে সোহাগ দেখাতে হবে না। বাঁচাতে হবে না আমায়। যে বেঁচে থাকলে তোমার দশ দিক আলো হয়ে উঠবে—সেই জন্ম জন্ম বেঁচে থাকুক্।

গজ্ গজ্ করতে লাগলো তরুবালা। পরিমলবাবু আর কিছু বললে না। হাতের বইখানা ও আলোটা নিয়ে ঘরের বাইরে এসে সিঁড়ির কোণে চুপ ক'রে আপন মনে পড়তে বস্‌লো। মনে কোন বিকার নেই—নেই মুখে কোন বিরক্তির চিহ্ন। তরুবালা বরাবরই মুখরা। একটু রাগলে যা মুখে আসবে—তাই বলবে। কি বলছে এবং কাকে বলছে—সে সব সে মোটে ভাবতেই পারে না। আজ অনেকদিন ধ'রেই টিপে টিপে ব'লে আসছে পরিমলবাবুকে সুধার নামে খোঁটা দিয়ে; কিন্তু পরিমলবাবু কোনদিনই তার যোগ্য প্রত্যুত্তর করে নি। কথার পিঠে পেড়েছে অন্য কথা। যখন না পেরেছে—তখন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তরুবালার রাগটা অমনি গিয়ে পড়তো ছেলে মেয়ের ওপর। তা'রা তখন বিনা দোষে মার-ধর গাল খেতো তরুবালার কাছে।

এক একটা লোকের থাক থাকে কেমন সাধারণ মানুষের উঁচুতে। নীচের থাকে তা'রা কিছুতেই নামে না—নামতে পারে না। যেমন আগুনের শিখা—তা'র গতি উর্দ্ধদিকে। জোর ক'রে শিখাকে মুচড়ে

ঘুরিয়ে নীচুমুখো ক'রে রাখলেও—তৎক্ষণাৎ ওপরের দিকে সে উঠবেই। ঠিক সেই রকম পরিমলবাবু। সুধাকে নিয়ে একটা কল্পিত নোঙ্‌রা সম্পর্ক খাড়া ক'রে এই যে তরুবালা পরিমলবাবুকে প্রায়ই নিত্য নিয়ত খোঁচা দিতো—তাতে কিছুমাত্র বিচলিত হ'তো না পরিমলবাবু।

কিন্তু এত বিচলিত হ'য়ে পড়লো শেষ পর্য্যন্ত তরুবালা যে, একদিন সারা রাত পরিমলবাবুর সঙ্গে গজ্ গজ্ ক'রে, পরের দিন সকাল বেলা একখানা রিক্‌শ ডেকে, ছেলে মেয়ে দু'টোকে তাইতে তুলে, নিজে চড়ে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে—শ্যামবাজারে তা'র দিদির বাড়ি চলে গেল।

পরিমলবাবু জিজ্ঞেস করলে যাবার সময়, কোথায় যাচ্ছ ছেলে মেয়ে নিয়ে ?

উত্তর দিলে তরুবালা বেশ উগ্র কণ্ঠে, যমের বাড়ি।

আর কিছু বললে না পরিমলবাবু। সময় হ'লে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল স্কুলে পড়াতে।

পরের দিন প্রায় বিকেল তিনটে চারটের সময় সুধা কি মনে ক'রে একবার নীচে নামলো। পরিমলবাবুর ছেলে মেয়েকে কোথাও দেখতে না পেয়ে পা-পা ক'রে এগিয়ে গেল ঘরের দরজাটার দিকে। ভেজানো ছিল দরজা। সুধা কিছু বুঝতে পারছিল না। জানতেই সে পারে নি কিছু। দরজায় ঘা দিয়ে ডাকতে সুধা সাহস করছিল না। তা'র উপস্থিতি তরুবালা যে আর মোটেই পছন্দ করে না—এটা সুধা

জানতে পেরেছিল তরুবালার হাব-ভাবে। কিন্তু কি ব্যাপার! ঘরের মধ্যে কোন সাড়া শব্দ নেই—একটা তো খোঁজ নেওয়া তা'র বিশেষ প্রয়োজন। চুপ ক'রে সে থাকবে কেমন ক'রে। চুপ ক'রে সে রইলো না। দরজায় টোকা দিয়ে আস্তে আস্তে ডাকলে, পরিমলদা'—পরিমলদা'—

—কে—সুধা? দরজা খোলাই আছে—ঠেলে ভেতরে এস'।

পরিমলবাবুর গলা পাওয়া গেল।

ঘরে ঢুকেই সুধা পরিমলবাবুর দিকে চেয়ে ব'লে উঠলো, এ কি! কি হয়েছে আপনার, পরিমলদা'? অমন ক'রে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে প'ড়ে আছেন এই অবেলায়!

পরিমলবাবু হঠাৎ কেমন অসুস্থ হ'য়ে পড়ে, তরুবালা ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে গেলে—আগের দিন রাত থেকেই। বেশ জ্বর দেখা দিয়েছিল। পরিমলবাবু কিন্তু কারোয় ডাকাডাকি করে নি।

পরিমলবাবু বললে, কিছু তেমন হয় নি, সুধা—এই কাল রাত থেকে একটু জ্বর হয়েছে। তাই শুয়ে প'ড়ে আছি।

জিজ্ঞেস করলে সুধা, বৌদি ছেলে মেয়েরা কৈ—তাদের দেখতে পাচ্ছি না যে!

মৃদু হেসে পরিমলবাবু উত্তর দিলে, তোমার বৌদি ছেলে মেয়ে নিয়ে কাল সকালে রিকৃশ ডেকে কোথায় যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করতে ব'লে গেল—যমের বাড়ি যাচ্ছি। বোধ হয় এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেছে—শীগ্‌গীর এখন ফিরবে না।

—কি ব্যাপার—ঝগড়া ক'রে চলে গেছে বুঝি?

—কি ক'রে জানবো বলো, সুধা? ওদের কোনটা আলাপ আর কোনটা প্রলাপ এতদিনেও তা আমি কিছু বুঝতে পারলুম না—বড়ই বোকা আমি!

পরিমলবাবুর চোখমুখ বেশ লাল হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি যেন ঘোরালো। মাথার চুল উস্কখুস্ক। মাথার পাশে বালিশের ওপর একখানা খোলা বই। সুধা বুঝতে পারলে, সে ঘরে ঢোকবার আগে পরিমলবাবু বইখানা পড়ছিল। বিছানার কাছে এগিয়ে গেল সুধা। যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলে, কাল বৌদি চলে যাবার পর থেকে এখন পর্য্যন্ত কি খেয়েছেন?

পরিমলবাবু উত্তর দিলে, দাঁড়াও সুধা—মনে ক'রে দেখি। না—না—কাল থেকে কিছু খাই নি। ক'দিন আগে থেকেই শরীরটা কেমন একটু খারাপ খারাপ যাচ্ছিল। তাই উপোস দিলুম একেবারে টেনে। আজ সকালে খান কয়েক বিস্কুট ছিল ঘরে—তাই খেয়েছিলুম। এইবার বোধ হয় জ্বরটা ছেড়ে যাবে'খন।

সুধা পাশে দাঁড়িয়ে আর থাক্‌তে না পেরে পরিমলবাবুর কপালখানায় একবার হাত দিয়েই চমকে ব'লে উঠলো, এ কি—এ যে গা একেবারে আপনার পুড়ে যাচ্ছে! এই আপনার একটুখানি জ্বর! জ্বর কত—থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখেছেন কি?

—না—তা দেখা হয় নি।

—কি আশ্চর্য্য! পরিমলদা'—না হয় আমি পর। কিন্তু বিপদের সময় মানুষ তো পরকেও ডাকে। কাল থেকে এই কাণ্ড চলছে—আর একবারখানি আমায় চেঁচিয়ে ডাকতে পারেন নি?

—ডাকবার মত অবস্থা কি আমার হয়েছে! আমি তো তেমন কিছু বুঝতে পারছি না। কেবল এইটুকু বোধ হচ্ছে—গায়ে হাতে বড় ব্যথা—আর খুব দুর্ব্বল।

—আমি ওপর থেকে থার্ম্মোমিটার নিয়ে আসি। আপনার জ্বর কত দেখতে হবে।

—না—না—থাক্—থাক্, সুধা—অত ব্যস্ত হ'তে হবে না।

কিন্তু সুধা ব্যস্তই হ'য়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরে ছুটে গেল থার্ম্মোমিটার আনতে। এনে জ্বর দেখলে। পরিমলবাবুর জ্বর তখন ১০৩° ডিগ্রির ওপর।

জিজ্ঞেস করলে পরিমলবাবু, কত জ্বর দেখলে, সুধা ?

সুধা বললে, বেশি নয়—যৎসামান্য। খুব হয়েছে—ওদিকটায় স'রে শুন একটু। মাথা থেকে পিঠ পর্য্যন্ত তো একেবারে বিছানাটা ভিজে শপ্-শপ্ করছে দেখছি। এসব বদলাতে হবে। একটু সরুন।

—জল খেতে গিয়ে হাত থেকে জলের গেলাসটা তখন কেমন পিছলে বিছানার ওপর পড়ে গেছলো। আচ্ছা—আমি উঠে বস্ছি—উঠে বসছি।

এই ব'লে পরিমলবাবু ধড়্মড়্ ক'রে বিছানার ওপর উঠে বসতে যাচ্ছিলো।

সুধা অমনি একটা সস্নেহ ধমক দিয়ে ব'লে উঠলো, না—না—আপনাকে অত জ্বরের মাথায় উঠে বসতে হবে না—শুয়ে থাকুন। আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

তারপর সুধা সমস্ত যত্ন ঢেলে দিলে পরিমলবাবুর সেবায়। নতুন ক'রে এখান থেকে ওখান থেকে চাদর বালিশ টেনে টেনে বিছানা পরিষ্কার করলে। পরিমলবাবুর গায়ের জামা পরণের কাপড় সব নতুন বদলে দিলে। ঝাঁটা বার ক'রে ঝাঁট দিলে ঘর। দু'একটা এঁটো গেলাস বাটি প'ড়ে ছিল—ছাই দিয়ে মেজে কলের জলে ধুয়ে মুছে নিয়ে এলো। এই সব সারতে সারতে হয়ে গেল সন্ধ্যে। আলো জ্বাললে—চৌকাটে গঙ্গাজল ছিটোলে। শাঁখ বাজালে। ঘরের মধ্যে খুঁজে খুঁজে কোথাও ধূপকাটি পেলে না। ওপরে নিজের ঘর থেকে নিয়ে এলো এক প্যাকেট ধূপ। জ্বেলে দিলে ঘরের

ভেতর তিন চারটে ধূপকাটি। এক মুহূর্ত্তে ঘরের শ্রী গেল ফিরে। কাল থেকে কি অপরিষ্কার অবস্থায় না পড়েছিল ঘরখানা! সুধা আবার ওপরে গেল। নিয়ে এলো হরলিক্সের শিশি—আর তার ষ্টোভ্‌টা। পরিমলবাবুর কপালে আবার একবার হাত দিয়ে দেখলে।

জিজ্ঞেস করলে, জ্বরটা বোধ হয় আরও বাড়ছে এখন, পরিমলদা'?

—কিছু তো আমি বুঝতে পারছি না, সুধা।

—আর আপনাকে কিছু বুঝতে হবে না। যা' বুঝি—আমি করব'খন।

পরিমলবাবু এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে সুধার কার্য্যকলাপটুকু কেবল দেখছিল।

বললে, সুধা, তুমি তো আমার ঘরখানা বেশ গুছিয়ে দিলে দেখছি।

এ কথার কোন উত্তর দিলে না সুধা। জিজ্ঞেস করলে, পরিমলদা' —কাল থেকে তো কিছু খান নি। একটু হরলিক্স ক'রে দিই—খান্।

—দেবে—দাও।

—দাঁড়ান—কপালে একটু জলপটি দিয়ে দিই আগে। জ্বরটা খুব বাড়ছে বুঝতে পারছি।

সুধা পরিমলবাবুর কপালে ভিজে ন্যাকরার জলপটি চাপিয়ে ষ্টোভ্‌ জ্বেলে হরলিক্স তৈরি করতে ব'সলো।

জিজ্ঞেস করলে পরিমলবাবু, সন্ধে হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ—আজ ছাত্রীকে পড়াতে যাবে না, সুধা?

সুধা বললে, না। আপনাকে হরলিক্সটুকু খাইয়ে আমি ডাক্তার-বাবুকে ডেকে আনতে যাবো এখুনি।

—আজ রাতটা থাক্, সুধা—ডাক্তার ডাকতে হবে না। কাল সকালে মনে হচ্ছে জ্বরটা ছেড়ে যেতে পারে।

—নাও তো যেতে পারে।

এই ব'লে সুধা চেয়ে দেখলে পরিমলবাবুর মুখের দিকে। ঘন ঘন জোরে নিশ্বাস পড়ছে পরিমলবাবুর। চোখ দুটো একেবারে জবাফুলের মত লাল হ'য়ে উঠেছে। মুখের লাবণ্য আর কিছু নেই। প্রবল জ্বরের উত্তাপে যেন তা' পুড়ে পুড়ে ঝল্‌সে উঠেছে। তাড়াতাড়ি একটুখানি হরলিক্স বাটিতে তৈরি ক'রে নিয়ে বিছানার ওপর পরিমল-বাবুর পাশে ব'সে চামচ ক'রে ধীরে ধীরে খাওয়াতে লাগলো পরিমলবাবুকে।

—কি গো, বৌদি, কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না—চুপ ক'রে কি করছো ঘরে—

এই বলতে বলতে এমন সময় নলিনী এক মুখ পান চিবুতে চিবুতে ডান হাতের একটা আঙুলের মাথায় খানিকটা চূণ টিপে ধ'রে ঘরে ঢুকেই একেবারে সুধা ও পরিমলবাবুকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো। পথে চলতে চলতে বর্ষায় ভেজা সবুজ তাজা ঘাসের মধ্যে ফণা-তোলা জাত সাপকে হেলতে দুলতে দেখলে মানুষ যে রকম ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে চমকে ওঠে—নলিনী চমকে উঠলো ঠিক সেই রকম।

কিগো—তুমিও চমকে উঠলে না কি! চম্‌কাবার কিছু নেই! কথাগুলো আর শুনতে ভালো লাগছে না বুঝি! তা না লাগুক—তবু শুনে যাও। আমার আজ বলতে বেশ ভালো লাগছে। বলবো বলবো—অনেকের অনেক কথা ভেতরে একেবারে ঠাসা আছে এখনো—সব ব'লে যাবো। আজ যে আমায় বলার নেশায়

পেয়েছে। এ নেশা ছুটবে কবে জানি নে। একটা কেমন যেন ঘুর লেগেছে আমার। এ সব কথা কারোয় বলবো নাই-ই—মনে করেছিলুম। কিন্তু কে যেন আমায় বলাচ্ছে। আমার এ পেশা নয়—এ আমার নেশা গো—নেশা। আমাতে কি আর আমি আছি! কেমন যেন হ'য়ে গেছি। না বললে—স্বস্তি পাচ্ছি না যে মোটে। চাপবো আর কত! শেষে গুমরে গুমরে ফেটে পড়বো না কি!

ঐ শোন কে আসছে?

—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—

শুনতে পাচ্ছ না—গরীবের কাতর প্রার্থনাটুকু? আমি যে আজও বেশ শুনতে পাচ্ছি, সেই প্রথম দিনের ডাকের মত। এখনও যে আমার কানে ঠিক সেইরকম বাজছে, যেমনটি বেজেছিল সেই সেদিন রাত আটটার সময়।

—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—

রাস্তার ভিখিরী—হাত পেতে ভিক্ষে ক'রে বাসায় ফিরছে। দু'টি চোখ অন্ধ—একটি আট ন' বছরের ছেলের হাত ধ'রে চলছে। ছেলেটির পরণে একটা ময়লা হাফ্‌প্যাণ্ট—গায়ে একটি ছেঁড়া ছিটের সার্ট। কি করুণ মুখখানি ছেলেটার! আহা—দুধের মত ধব্‌ ধব্‌ করছে ছেলেটার গায়ের রঙ্‌। সরু সরু হাত—লিক্‌ লিক্‌ করছে পা। দারিদ্র্যের পেষণে চেপে ধরেছে তা'র বালকসুলভ চপলতা। একটা কঠোর আর্ত্তি মুখে মাখানো! চোখের চাহনি কি নিদারুণ অনুকম্পা-প্রার্থী! অন্ধ ভিখিরীর বাঁ হাতখানা ধ'রে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ছেলেটি। ভিখিরীর বেশ বয়স হয়েছে। ডান হাতে একটা লাঠি ধ'রে চলছে ছেলেটির সাথে সাথে। দয়া ক'রে যে যা দু'এক পয়সা দিচ্ছে, ছেলেটি তার ছেঁড়া জামার পকেটে রাখছে। ভিখিরীর মুখে ঐ এক সকাতর প্রার্থনা—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'।

চেয়ে আছি ছেলেটির দিকে আর শুনছি অন্ধের আবেদন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল তা'রা আমার দিকেই। এলো শেষ পর্য্যন্ত—ছেলেটি দাঁড়ালো অন্ধের হাত ধ'রে আমার পাশেই। হাত পেতে দাঁড়ালো ছেলেটি—অন্ধ জানাতে লাগলো তা'র প্রার্থনা!

এ কি হ'লো—আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো কেন! আমি তো গোবিন্দ নই! এ জগৎ-সংসার তো আমার নয়! গোবিন্দকে ডাকছে—গোবিন্দ দয়া করবে! আমি কি দয়া করবার মালিক!

খুলে গেল অমনি দোতলার জানলাটা—বনমালী শিকদারের বাড়ির। প্রমীলা একবার দেখলে চেয়ে। সে অমন মাঝে মাঝে দেখে। নারীর অন্তর কেমন কেঁদে ওঠে গরীবের ব্যথায়! ডাকে সে ভিখিরীদের—দেয় টাকাটা সিকেটা যখন যেমন ইচ্ছে হয়। পরক্ষণেই স'রে গেল জানলার কাছ থেকে প্রমীলা। একটু পরে বেরিয়ে এলো বাড়ির এক ঝি। ছেলেটির হাতে দিলে ছ'টো টাকা।

ছেলেটি বললে, বাবা, এই মা ছ'টো টাকা দিয়েছে।

একটা ক্ষীণ আনন্দের দীপ্তি খেলে গেল অন্ধের সারা মুখখানির ওপর। বললে, বেঁচে থাকো মা—বেঁচে থাকো! ভগবান্ তোমার ভালো করুক!

চলে গেল অন্তঃপুরের দাসী অন্তঃপুরে। নিয়ে গেল অন্ধের বুক-ভরা আশীর্ব্বাদ।

ছেলেটি বললে, বাবা—আজ আর ঘুরতে হবে না। বাসায় ফিরে চল'। রাত হয়ে গেছে। দিদি ব'সে ব'সে ভাবছে হয় তো।

অন্ধ বললে ছেলেটির মাথায় হাত বুলিয়ে, তাই চল'—বাবা পণ্টু, ঘরে ফিরে চল'। আবার কাল বেরুব'খন। অনেকটা পথ আজ হেঁটেছিস্—পায়ে ব্যথা হচ্ছে না তো?

—না—বাবা।

ঘুরে দাঁড়ালো ছেলেটি অন্ধের হাত ধ'রে। এবার বাসায় ফিরে যাবে তা'রা।

—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—হা গোবিন্দ, দয়া কর'।

ওরে—কে রে—কে রে! এ যে আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর! আমি যে এতক্ষণ বুঝতে পারি নি—জানতে পারি নি কিছু। তাই প্রথম থেকেই ওর ডাক শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন শিউরে শিউরে উঠছিল! ওরে কে আছিস্—ধর্ ধর্—ও যে আমাদের এই পাড়ার সেই শ্রীনাথ ময়রা রে—ঐ ছেলেটা যে প্রমীলার ছোট ছেলে—সেই কোলের পণ্টু রে! ওরে ধর্—ধর্—

কি চিৎকারই সেদিন না করলুম, ভাই—হায়, আমার ডাক কেউ শুনতে পেলে না! ছুটে গিয়ে ধরবার উপায় নেই আমার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছি কেবল। দেখছি চেয়ে—ওরা এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অন্ধ পিতার হাত ধ'রে ছোট ছেলেটি যে হারিয়ে যাচ্ছে আবার বিপুল জনস্রোতে। 'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—এখনও যে ডাকটা শুনতে পাচ্ছি বেশ। গেল—গেল—ফস্‌কে গেল বুঝি রে! থাকতে পারি নি—সেদিন থাকতে পারি নি স্থির হ'য়ে! নিরুপায়ের উপায় সেই গোবিন্দকে আমিও শেষে ডাক ছেড়ে ডাকতে লাগলুম—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—'হা গোবিন্দ, দয়া কর'।

ওকি—ওকি—ওদিকে কি হ'লো বনমালী শিকদারের বাড়িতে—দোতলার ঐ বড় ঘরখানার মধ্যে! প্রমীলা অমন ছুটোছুটি করছে কেন—একবার এ জানলায়, একবার ও জানলায়! কি হ'লো প্রমীলার! মুখখানা একেবারে মুহূর্ত্তে পাংশু বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন! কি উৎকণ্ঠা-মিশ্রিত ব্যাকুল চাহনি তা'র! তবে কি জানতে পেরেছে—চিনতে পেরেছে—বুঝতে পেরেছে প্রমীলা অন্ধের কণ্ঠস্বরে! কি হ'লো—কোথায় ছুটে গেল প্রমীলা!

বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো আবার সেই ঝিটা। দৌড়ে গেল অন্ধের কাছে। কি বললে। ফিরে দাঁড়ালো পল্টু। অন্ধের হাত ধ'রে ঝিয়ের পিছু পিছু আবার আসতে লাগলো এদিকে।

সর্ব্বনাশ হ'লো বুঝি রে! দে—দে—ওদের তাড়িয়ে দে এপাড়া থেকে। আর এক পাও এগুতে দিস নি ওদের! আর কোন দিন যেন এ পাড়ায় না ঢোকে ওরা। মেরে ফেলবে—মেরে ফেলবে বোধ হয় বিষ খাইয়ে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে। কুলত্যাগিনী নারীর অসাধ্য কিছু নেই! স্বামী-পুত্র-কন্যা বর্জ্জন ক'রে যে নারী পরাঙ্ক-শায়িনী হ'য়ে থাকে—সে নারী বিষধরী—মানবের পরম ও চরম বৈরি! প্রমীলার সান্নিধ্য থেকে ওরে তোরা সরিয়ে দে—সরিয়ে দে শ্রীনাথ ময়রাকে! এ পাড়ার ত্রিসীমানা থেকে দূর ক'রে দে—দূর করে দে তার ছোট ছেলে পল্টুকে!

কেমন সেদিন আমি একেবারে যেন ক্ষেপে গেছলুম। সমানে আপন মনে চেঁচিয়ে মরেছি খানিকক্ষণ। হায় রে—ভাষা আমার কেউ শুনতে পায় না—বুঝতে পারে না কেউ আমার কথার অর্থ!

আর চেঁচাতে পারলুম না। হাঁপিয়ে পড়েছিলুম বড়। চুপ ক'রে গেলুম তাই। আমার পাশ দিয়ে তা'রা তিনজনে এগিয়ে গেল দেখলুম। বাড়ির ঝিটা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। আমি নির্বাকে চেয়ে রইলুম বনমালী শিকদারের বাড়ির দিকে। অদম্য কৌতূহলে ভ'রে উঠেছে আমার সম্পূর্ণ ভেতরটা। তাই স্বস্তি পাচ্ছিলুম না কিছুতেই। উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলুম খোলা জানলাটার মধ্য দিয়ে।

ও কি দেখছি! ও যে একেবারে দোতলার বৈঠকখানায় নিয়ে তুলেছে অন্ধ ভিখিরী আর ছোট ছেলে পল্টুকে! কি যেন জিজ্ঞেস করলে ছেলেটাকে—শুনতে পেলুম না। কি যেন উত্তর দিলে ছেলেটা—তাও পেলুম না শুনতে।

ও কি হ'লো! প্রমীলা একেবারে ঘরের মধ্যে ছুটে এসে বুকের মাঝে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রলে পল্টুকে। অন্ধ ভিখিরী শ্রীনাথ ময়রা কিছু দেখতে পায় না। আহা—ভগবান্ বাঁচিয়েছেন তা'রে দু'চক্ষু সম্পূর্ণ অন্ধ ক'রে দিয়ে। প্রমীলা পল্টুকে বুকে ক'রে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। কেমন যেন হ'য়ে গেল প্রমীলা! রুদ্ধ মাতৃত্বের লাঞ্ছনায় তীব্র অনুতাপবহ্নি যেন একেবারে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো হঠাৎ তা'র বুকের মধ্যে। পল্টুর মুখখানা আপনার কঠোর-কোমল বুকের ওপর চেপে ধ'রে রগড়াচ্ছে কেবল। মুখে বলতে পারছে না কিছু প্রমীলা। ফুলে ফুলে উঠছে কি একটা মর্ম্মভেদী অন্তর-আবেগ—ঠিক যেন জোয়ারের জলের মতন! দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। আর চাপ্‌তে পারলে না—'খোকা-খোকা' ব'লে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন বান ডাকলো প্রমীলার দু'চোখে। পল্টু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ছেলেমানুষ—বুঝতে পারে না কিছু। অদূরে দাঁড়িয়ে

ঝিটাও ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছে—দেখ্ছে প্রমীলার কাণ্ড-কারখানা—সেও পারে না কিছু বুঝতে।

বনমালী শিকদার কোথায়? সে তো এখানে নেই। আজ দিন সাতেক হ'লো রাঁচি চলে গেছে। ভবেশ পালিত রাঁচি থেকে টেলিগ্রাম করেছিল—শীগ্গির চলে আসতে—সাপ্লাই ব্যাপারে সেখানে গোলমাল বেরিয়েছে খুব। তাই সামলাতে বনমালী শিকদার একাই ছুটে গেছে রাঁচিতে—রাঁচির মিলিটারী ক্যাম্পে। যাবার সময় ব'লে গেছে প্রমীলাকে, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরছি—ভেবো না কো কিছু।

অন্ধ শ্রীনাথ ময়রা বনমালী শিকদারের দোতলার বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে। বাঁ হাত দিয়ে হাতরাচ্ছে পণ্টুকে। কাছে না পেয়ে ডাকলে, বাবা পণ্টু—পণ্টু—কোথায় রে? কৈ গো মা—এখানে ডেকে আনলে কেন? রাত হ'য়ে যাচ্ছে যে, মা। ওদিকে বাসায় মেয়েটা যে আমাদের পথপানে চেয়ে ব'সে আছে, মা।

প্রমীলার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো এতদিন পরে এত কাছে শ্রীনাথ ময়রার কণ্ঠস্বর শুনে। মনে পড়লো, বড় মেয়ে পারুলটাকে। মেয়েটা কত বড় হয়েছে এখন! তারপর জোর ক'রে সামলে নিলে নিজেকে। ঝিকে আস্তে আস্তে বললে, ওরে—ওকে ঘরের চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিয়ে আয়। বল্—কোন ভয় নেই। একটু পরেই পণ্টুকে নিয়ে বাসায় যাবে'খন।

এই নির্দেশ দিয়ে ঝিকে, প্রমীলা পণ্টুকে বুকে চেপে ধ'রে পাশের ঘরে ঢুকে দরজা দিলে্ বন্ধ ক'রে—একেবারে সশব্দে খিল এঁটে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দরজা খুললে প্রমীলা। পণ্টুর হাত ধ'রে এগিয়ে গেল বৈঠকখানা ঘরের দিকে। শ্রীনাথ ময়রার

কাছে না দাঁড়িয়েই থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিল প্রমীলা। মুখে একটিও কথা ফুটছিল না তা'র।

পল্টু এসে শ্রীনাথ ময়রার কাছে দাঁড়ালো। বললে, চল বাবা—এবার বাড়ি যাই।

উঠে দাঁড়ালো অমনি শ্রীনাথ ময়রা। বাঁ হাতখানা এগিয়ে দিলে—পল্টু হাত ধরলে অন্ধ বাপের। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো দু'জনে। প্রমীলা আর দেখতে পারলে না সে দৃশ্য। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ মুছে, দাঁড়ালো এসে খোলা জানলাটার সামনে। ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়লো তা'র মুখের ওপর। এক মুহূর্তে কি ফ্যাকাশে বিবর্ণ হ'য়ে গেছে প্রমীলার অমন সুন্দর মুখখানা। ঠিক যেন একটা আঁধি ব'য়ে গেল দারুণ গ্রীষ্মের দিনে—একটা থরে থরে সাজানো ফুল বাগানের ওপর। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—যেন একখানা মর্ম্মর মূর্ত্তি! একখানা যেন পাথরের চাঁই—ডাইনামাইট্ দিয়ে ফাটানো হয়েছে যেন এই কিছুক্ষণ আগেই!

অন্ধ শ্রীনাথ ময়রার হাত ধ'রে পল্টু বেরিয়ে এলো বনমালী শিকদারের বাড়ি থেকে। ল্যাম্পপোস্টটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বলছিল পল্টু, বাবা—এরা খুব বড়লোক।

—তাই না কি!

—হ্যাঁ বাবা। একটা বৌ আমায় খুব আদর করেছে—যত্ন করেছে—চুমো খেয়েছে।

—বেশ বাবা—বেশ। বোধ হয় মেয়েটির ছেলে পুলে নেই—তাই তোমায় অত ভালোবেসেছে।

—আর, বাবা, আমায় অনেক টাকা দিয়েছে। ব'লেছে—আর তোমার হাত ধ'রে ভিক্ষে করতে হবে না। যখন যা' দরকার হবে, আমায় গিয়ে চেয়ে আনতে বলেছে।

—আহা—মা তা'লে রাজরাণী—রাজরাণী !

একটা অব্যক্ত আবেগে টলমল ক'রে উঠলো শ্রীনাথ ময়রার বুকের ভেতরটা। কি মনে ক'রে ওপর দিকে মুখ তুলে ব'লে উঠলো অমনি নরম গলায়—'হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ' !

পণ্টু আবার বলতে লাগলো, বাবা—আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রলে বৌটা—তোমার কথা, দিদির কথা। বেরিবেরি অসুখে তোমার চোখ দু'টো একেবারে কাণা হ'য়ে গেছে—সে কথা বললুম। উল্টোডাঙায় কোথায় আমাদের বাসা—তাও শুনলে। বললুম সব।

—বেশ ক'রেছ বাবা—বেশ ক'রেছ।

—কাল আবার আমায় আসতে ব'লে দিয়েছে—বরাবর গাড়ি ক'রে আসতে। তোমায় একেবারে ঘর থেকে রাস্তায় বেরুতে বারণ ক'রে দিয়েছে। খুব ভালো হয়েছে, বাবা—আর আমাদের ভিক্ষে ক'রতে হবে না। আমাদের যা' দরকার—সব পাঠিয়ে দেবে ব'লেছে বৌটা।

—আহা ! বাবা পণ্টু, রাজরাণীকে তুমি 'মা' ব'লে ডেকো। অমন 'বৌটা—বৌটা' ব'লো না।

জিজ্ঞেস করলে পণ্টু, বাবা, কাল আবার মার কাছে আসবো তো ? তুমি বারণ ক'রবে না ?

—না—বারণ ক'রবো কেন ? তুমি তোমার মার কাছে এসো।

দু'পা গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে পণ্টু, বাবা—দিদি বকবে না ?

—না—না—কেন বকবে ? আমি বলব'খন সব কথা।

আর ল্যাম্পপোস্টটা তাদের দেখতে পেলে না। তা'রা গিয়ে প'ড়লো বড় রাস্তাটায়। সাদা বাড়িটা অমনি তাদের আড়াল ক'রে দিলে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখছিল তাদের প্রমীলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে। চোখের তারা দু'টো তা'র আর নড়ছিল না। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় চক্‌চক্ করছিল প্রমীলার চোখ দু'টো। মনে হচ্ছিল সেদিন—শ্রীনাথ ময়রার মত প্রমীলা যেন অন্ধ হয়ে গেছে। দু'টো পাথরের চোখ যেন কেটে বসিয়ে দিয়েছে কোটরে। প্রমীলা আর দেখতে পাচ্ছিল না কিছু। একটা অত্যুজ্জ্বল আলোর ছটায় তা'র চোখ যেন ধেঁধে গেছে! সে দেখছে যেন কেবল জমাট অন্ধকার—আপনার বাহিরে ভিতরে। জীবনের অতীতে বর্ত্তমানে আরম্ভ হয়ে গেছে একটা দারুণ ঠোকাঠুকি—তারির জঘন্য কর্কশ শব্দটাই তা'র কানে যেন অনবরত বাজছে! আর কেবলি তা'র মনে হচ্ছে, এ জগতের সব কিছুই যেন তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ! জীবন তুচ্ছ—মৃত্যু তুচ্ছ—তুচ্ছ এর আলো বাতাস—তুচ্ছ এর প্রেম ভালোবাসা—তুচ্ছ এর স্নেহ-প্রীতি—তুচ্ছ এর সুখ দুঃখ—তুচ্ছ এর হাসি কান্না! কতক্ষণ এমন ভাবে সমাধিস্থ হ'য়ে ব'সে ছিল প্রমীলা, তা'র হিসেব ল্যাম্পপোস্টটা রাখে নি। কিন্তু তা'র রুদ্ধ মাতৃত্বে কলঙ্কিত নারীত্বে সেদিন যে খোঁচা লেগেছিল—তার ক্ষরণ প্রমীলা যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও থামাতে পারে নি, এ খবর এ সংসারে আর কেউ ঘৃণাভরে না রাখুক—ল্যাম্পপোস্টটা রেখেছিল।

তারপর কি সেবাটাই না ক'রে গেল সুধা পরিমলবাবুর। একেবারে একজ্বরী হ'য়ে প'ড়লো পরিমলবাবু। সাড় ছিল না কোনো। নিজের দেহটাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে দিতে হ'লো বাধ্য হ'য়ে সুধার হাতে। সুধা ডাক্তার আনলে, ওষুধ খাওয়ালে, ব্যবস্থা করলে পথ্যের। সারা রাত প্রায় পরিমলবাবুর মাথার কাছে জেগে ব'সে থাকতে হ'লো সুধাকে। মাঝে একদিন জিজ্ঞেস ক'রেছিল পরিমলবাবুকে, রেবার মাসীর বাড়ির ঠিকানাটা কি ?

—কেন ?

—একটা চিঠি লিখে জানানো উচিত।

—কি জানাবে—আমার অবস্থা ?

—হ্যাঁ। শেষে ফিরে এসে সব শুনে হয়তো আমার ওপর রাগ করতে পারে বৌদি।

জোর গলায় বললে পরিমলবাবু, না সুধা—আমার খবর কিছু জানাতে হবে না সেখানে। আমি বেশ আছি। তোমার বৌদির রাগ তোমার ওপর যতটা পড়ে—ততটাই ভালো। তবে সুধা, তোমায় একটা কথা ব'লে রাখি—আমি বুঝতে পারছি তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে আমাকে নিয়ে।

—না—পরিমলদা'—আপনি ভুল বুঝছেন। আমার পরম ভাগ্য যে—আমি এমন ক'রে সুযোগ পেয়েছি একটু আপনার সেবা করবার। আমার জীবনে হয়তো সমস্তটাই ক্ষতির খাতায় লেখা থাকবে। কিন্তু এটা আমি বেশ জানি—এইটুকু থাকবে আমার লাভের অঙ্কে।

একটু ম্লান হাসলে পরিমলবাবু। বললে, সুধা, জীবনের লাভ লোকসানের হিসেবটা এত তাড়াতাড়ি তো তুমি টানতে পারো না। এখনো অনেক দেরী আছে। আমার কি সাধ যাচ্ছে জানো—তোমার এই অক্লান্ত সেবার মাঝেই আমি যেন—

সুধা কথাটা শেষ ক'রতে দিলে না পরিমলবাবুকে। অত বড় অমঙ্গল কথাটা সে মোটেই শুনতে চাইলো না। একটা মৃদু সস্নেহ ধমক দিয়ে অমনি ব'লে উঠলো সুধা, থামুন আপনি। যা ব'লবেন— তা' বুঝতে পেরেছি। আমি শুনতে চাই না। অমন যদি মনে করেন—তা'হলে আমি এখুনি 'য়্যাম্বুলেন্স' ডেকে আপনাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দোব, তা' ব'লে রাখছি।

পরিমলবাবু বললে, তা তুমি কিছুতেই পারবে না, সুধা। তোমার ওটা কেবল মুখের কথা।

—কেন পারবো না, খুব পারবো! পারলেই ভালো হয়— চারিধারের অপ্রিয় মন্তব্যগুলো তা'লে থামা পায়।

—ও—তুমিও তা'হলে সব শুনেছ।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি সব শুনিছি—সব জেনেছি। বৌদি কি জন্যে তা'র দিদির বাড়ি গিয়ে ব'সে আছে—তাও বুঝতে আমার আর বাকি নেই। আপনি এখন চুপ ক'রে শুয়ে প'ড়ে থাকুন—ও সব কিছু আপনাকে ভাবতে হবে না।

—সুধা, এত শুনে জেনে বুঝেও তুমি আমার কাছে আসবে— আমার সেবা করবে?

জোর গলায় বললে সুধা, হ্যাঁ—করবো। আতুর জনের সেবা করবো—তাতে আবার কার কি? যে যা পারে বলুক—আমি কারোর কথা গ্রাহ্য করি না।

—ঐ সমস্ত অপ্রিয় কথা শুনে তোমার মনে লজ্জা করে না একটু, সুধা ?

—লজ্জা আমার পাওয়া উচিত নয়। লজ্জা পাওয়া উচিত তাদের, যারা ঐ সব বলে। যাক্—ও সব ছেড়ে দিন, পরিমলদা'।

জিজ্ঞেস করলে পরিমলবাবু, আচ্ছা—ধরো সুধা—যদি আমি আজ এ অসুখে মারাই যাই—তুমি তা'হলে এ পাড়ায় মুখ দেখাবে কি ক'রে ?

ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলো সুধা, জানি না—যান্।

টানা পনেরো দিন ধ'রে এই রকম চললো। একদিকে সেবা যত্ন শুশ্রূষা—অন্যদিকে শুধু চেয়ে থাকা আর কথা বলা! একদিকে দান—অন্যদিকে গ্রহণ! একদিকে শ্রদ্ধা ভক্তি—অন্যদিকে স্নেহ ভালোবাসা! একদিকে নারী—অন্যদিকে পুরুষ!

ব্যাধিটা খুব ঘোরালোই হয়েছিল পরিমলবাবুর। ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগলো। একদিন ডাক্তার এসে দেখে শুনে বললে, 'ফাষ্ট' ক্লাশ্ নার্সিং'এ—এ-যাত্রা বেঁচে গেলেন পরিমলবাবু।

সুধা ব'লে উঠলো, না—না—আপনার ওষুধে, ডাক্তারবাবু।

পরিমলবাবু হেসে বললে, কোনটাই কিছু নয়—এ আমার ভাগ্য।

ভাগ্যই বটে! লাঞ্ছনা অপমান, যশ কীর্ত্তি, প্রেম ভালোবাসা, আরোগ্য অনারোগ্য—সবই ভাগ্যের দান!

আজ অন্ন পথ্য ক'রবে পরিমলবাবু। আরোগ্যস্নান ক'রে উঠে দুর্ব্বল দেহে চেয়ারে ব'সে আছে। সুধা ওদিকে ব্যস্ত অন্ন পথ্যের ব্যবস্থায়। এমন সময় তরুবালা ছেলে মেয়ে নিয়ে উপস্থিত হ'লো। ফিরে এলো দিদির বাড়ি থেকে।

পরিমলবাবু পরিহাসের সুরে জিজ্ঞেস করলে, কি গো—যমের বাড়ি থেকে ফিরে এলে ?

এ কথায় কোন উত্তর দিলে না তরুবালা। তারপর সমস্ত শুনলে সুধার মুখে। বললে ঠেস দিয়ে পরিমলবাবুকে, আমি কি জন্মের মত সংসার ছেড়ে চলে গেছি যে, সুধাকে নিয়ে এমন ক'রে সংসার পেতে বসেছ! এত বড় বিপদ—আমায় একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে মন চায় নি কারোর! আচ্ছা—ভগবান্ আছেন—ভগবান্ আছেন!

পরিমলবাবু বললে, সে কথা সত্যি—ভগবান্ আছেন নিশ্চয়। নইলে এ অবস্থায় সুধাই বা অযাচিত এসে জুটলো কেমন ক'রে। আমি তো সেই কথাটাই ভাবছি—ভগবান্ আছেন—ভগবান্ আছেন!

সুধা তখন কাছে ছিল না। পরিমলবাবুর অন্নপথ্যের জন্যে কিছু পুরানো চাল দোকান থেকে কিনে আনিয়েছে অনেক কষ্ট ক'রে। তখন 'র‍্যাশন্'এর যুগ চলছে সহরে। এমনি চালই এক ছটাক পাওয়া যায় না—তা আবার রোগীর খাবার পুরানো চাল! যাই হোক্—সুধা সেই চাল ক'টি বাইরে কলের জলে ধুচ্ছিলো ভালো ক'রে কাঁকর-কাটি বেছে বেছে। শুনতে পায় নি এদের স্বামী-স্ত্রীর কথা।

তরুবালা সুধার কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখখানা ভারি ক'রে বললে, থাক্ সুধা—তোমায় আর কিছু করতে হবে না। খুব করেছ। আমি যখন এসে পড়েছি—তখন যা করবার আমিই করব'খন। তুমি রেখে দাও ওসব।

একটা খোঁচা লাগলো অমনি সুধার বুকে। তা'র বড় সাধ ছিল—সেদিন পরিমলবাবুর অন্নপথ্য সে-ই নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবে। বললে, বৌদি—তুমি এই হন্তদন্ত হয়ে এলে—এ বেলাটা একটু জিরোও না। আমি এ বেলা তোমাদের সকলের রান্না কাজটা সেরে দিচ্ছি।

—না—না—আমার সুসার আর তোমায় করতে হবে না।

অনেকখানি কাকুতি মিনতি প্রকাশ ক'রে বললে সুধা, বৌদি,

তোমার পায়ে পড়ি। রুগীর পথ্যটা অন্ততঃ আমায় রাঁধতে দাও আজ। আমি হু'টো খাইয়ে চলে যাচ্ছি।

কেমন অমনি হঠাৎ ব'লে উঠলো তরুবালা, তোমার পায়ে আজ মাথা খুঁড়ে মরবো, সুধা—যদি বেশি বাড়াবাড়ি কর'—তা ব'লে রাখছি।

পরিমলবাবু শুনতে পাচ্ছিল সব। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জোর গলায় ডাক্‌লে, সুধা—সুধা—

সুধা অশ্রুছলছল চোখে কাছে এসে দাঁড়ালো পরিমলবাবুর।

পরিমলবাবু বললে, সুধা—ওপরে তোমার ঘরে চলে যাও—আর এক দণ্ড এখানে দাঁড়িও না।

পরিমলবাবুর মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত ক'রে সুধা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে ধীরে ধীরে—মাথাটি নত ক'রে।

সুধা আর জোর পাচ্ছিল না দেহে। মনটা যেন তা'র একেবারে ভেঙে প'ড়লো। নারীর ভালোবাসায় বাধা দিলে সে ফোঁস করে ওঠে; কিন্তু নারীর সেবায় ব্যাঘাত ঘটালে, সে অমনি দংশন করবার জন্যে উদ্যত হয়। সুধা তাই রুখে দাঁড়ালো এবার। এ অপমান সে সহ্য করতে পারবে না কিছুতে। সুধা অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছিল—পরিমলবাবু জীবনে সুখী হ'তে পারে নি, আর পারবেও না কোন কালে—অন্ততঃ যতদিন তরুবালা বেঁচে থাকবে—ততদিন নয়। সুধার মনে এবার জাগলো একটা তীব্র বাসনা—পরিমল-বাবুকে সে তা'র অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা সমস্ত দিয়ে

সুখী করবে। এ অভিলাষ ছিল তা'র এতদিন মুকুলিত ; হঠাৎ সেদিন সেটা প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠলো। আর চাপতে পারলে না সে তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। কস্তুরী মৃগ যেমন ছট্‌ফট্ ক'রে মরে তা'র নিজের নাভির সুগন্ধে—সুধাও তেমনি তা'র নিজের একটা দারুণ অতৃপ্তিতে ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। খুঁজতে লাগলো একটা চরম প্রশান্তি—একটা ঠাণ্ডা নরম প্রলেপ বিষব্রণের মুখে। কোথায় যাবে—কি করবে—ভেবে পায় না কিছু। পরিমলবাবুকে সে চায়—মনে প্রাণে চায়। সেবায় ভালোবাসায় ভক্তি-শ্রদ্ধায় সে একেবারে লুকিয়ে রাখতে চায় পরিমলবাবুকে নিজের বুকের মধ্যে। এ কথাটা সুধা এতদিন বুঝতে পারে নি। স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মাঝে যেন এক একটা ক্ষণস্থায়ী ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্ উঠছিল মনে মনে—আবার তখনি সে বুদ্‌বুদ্ যেন ফেটে মিলিয়ে যাচ্ছিল একটা চির-রহস্যময় সত্তায় ! কিন্তু সেদিনকার চরম আঘাতে তা'র স্বপ্নের ঘোর গেল কেটে—সুষুপ্তির আমেজ গেল ছিঁড়ে। একেবারে যেন সম্পূর্ণ জাগরণে সে দেখতে পেলে দু'চোখ মেলে, তা'র অন্তর্নিহিত বুকের রক্তে লাল টকটকে রঙ্‌ ধ'রে পুষ্ট হয়ে উঠেছে নারীহৃদয়ের বাসনার অঙ্কুরগুলো। টনটনে ব্যথায় চঞ্চল হয়ে উঠছে যেন। হওয়াটাই স্বাভাবিক—অস্বাভাবিক কল্পনার নিরর্থক ফাঁকা সুষমা এ নয়—হয় তোমারও—হয় আমারও—পৃথিবীর জল-হাওয়ায় যদি ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে ওঠে তোমার আমার রক্তমাংসের দেহ !

কিন্তু সে-বাসনা চরিতার্থ করবার সুধার পথ কৈ ! প্রশস্ত রাজপথ না হোক—একটা ছোটখাটো সঙ্কীর্ণ গলিও তো খুঁজে পাওয়া যায় না ! এতখানি সাধের সাধনা কোথায় ! সেইটা নেই ব'লে কি এতটা যাতনা তা'র ! এক এক সময় সুধা মনে করে—আজ দু'কথা সে তরুবালাকে শোনাবে। সিঁড়ির আধপথ সে নেমে যায় তর্ তর্

ক'রে তেমন ভাবে শোনাতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কে যেন তা'রে টেনে ধরে। আপন শিক্ষা সংস্কৃতিতে সে বাধা পায় প্রতিপদক্ষেপে। জল্‌জ্বল্ ক'রে চোখের সাম্‌নে অমনি যেন ভেসে ওঠে পরিমলবাবুর মুখখানা। কি সৌম্য—কি শান্ত—কি স্নিগ্ধ! তা'র এই প্রতিহিংসায় পরিমলবাবুই যে কষ্ট পাবে—নষ্ট হবে যে পরিমলবাবুর প্রসন্নতা! সুধা পারে—তেমন ইচ্ছে করলে সুধা পারে তরুবালার ওপর প্রতিশোধ নিতে—তরুবালার জীবন বিষময় ক'রে তুলতে। সুধা কুমারী—কুমারীর প্রেমসাধনার কঠোরতা অতি দুর্বার—কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। সুধা পারে তাই তার জীবনের এ দুশ্চর ব্রত এক মুহূর্ত্তে সফল ক'রে তুলতে—তরুবালার এই গর্ব্ব অহঙ্কার আপনার দু'পায়ে দলিত মথিত ক'রে দিয়ে।

কিন্তু সুধা পারে না তা'। তেমন পারলে পরিমলবাবুকে উচ্চস্তর থেকে জোর ক'রে নীচে নামাতে হয়—অতি জঘন্য ক্লেদ-গ্লানির পঙ্কে পরিমলবাবুকে ডোবাতে হয়। তাতে সুধার জয় নয়—সুধার নিদারুণ পরাজয়। তাই নীরবে কেবলি গুমরে গুমরে মরতে লাগলো সুধা।

কেন এত কথা বল্‌ছি জানো। আমি যে দেখেছি সুধাকে—একা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে। মুখে ফুটে উঠেছে চিন্তার আল্‌পনা—বুকে জেগে উঠেছে আশার কল্পনা—চিত্তে আঘাত হেনেছে নীতির জল্পনা। আপন মনে ফোঁস্ ক'রে উঠেছে—তুলে ধরেছে মোহিনী ফণা—আবার পরক্ষণেই কি ভেবে গুটিয়ে নিয়েছে সব নিজের কুণ্ডলীর মধ্যে। সে কি অপরূপ শোভা—সে কি সুন্দর আভা! দেখে নি যে তা' কেউ! দেখলে কি আর আমি এমন ক'রে বলি। প্রতি দিনটি তখন ফুটে উঠতো সুন্দর হয়ে—মধুর হয়ে নামতো তখন প্রতি রাতটি। দিনে রাতে একটা অনবদ্য দ্বন্দ্ব চল্‌তো সুধার

বুকে। কখনো নিশ্বাস পড়তো ঘন ঘন—কখনো শান্ত স্থির। সুধার রাগে অনুরাগে লাগতো বেশ তালে লয়ে ঠোকাঠুকি। রাগে তা'র সারা মুখখানা লাল হয়ে উঠতো—চোখের কোণে খেলতো যেন বিজলি-ঝলক। আবার অনুরাগে যেন গোলাপী রঙের তুলি বুলোত' তা'র দুগালে—চোখের চাহনি হয়ে আসতো কমনীয়। ওগো—আমি যে দেখেছি সুধাকে এমনি করে নানা সাজে সাজতে—নানা রঙে রাঙ্‌তে! সুধার সে দিনগুলো গেছে উভয় সঙ্কটের। যাকে সে আঘাত দিতে চায়—আঘাত লাগে না তাকে। প্রতি-আঘাত বেজে ওঠে আর এক জায়গায়—যেখানে সে মোটেই চায়না পীড়া দিতে। এতে যে সুখের চেয়ে দুঃখের মাত্রাটাই বেশি। তাই না!

আর পরিমলবাবু—সেই পূর্ব্বের মত শান্ত নির্বিকার। এত বড় বিপর্যয়ের ঝড়—যেন কিছুই লাগেনি তা'র অঙ্গে। গঙ্গার বুকে বাঁধা বয়ার মত স্রোতের আঘাতে আঘাতে দুলছে উঠছে নামছে যেন! সেই আপন সাধনায় মগ্ন! সেই হাসি-হাসি মুখ—সেই স্নেহ-প্রীতি-ভরা প্রাণ।

তারপর দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঝ'রে ঝ'রে পড়তে লাগলো এক একটি ক'রে মহাকালের অঙ্গ থেকে—ঠিক যেন জীর্ণ শুকনো পাতার মত। ওপরের ঘরে অভিমানে ফুলে মরে সুধা—নীচের ঘরে তরুবালা গর্জায়, ঝঙ্কার তোলে—মাঝে দাঁড়িয়ে পরিমল বাবু দেখে সব, শোনে সব। কারোয় কিছু বলে না। মুখ খুললে দেখা শোনার আনন্দ যায় মাটি হয়ে।

একদিন রাতে পরিমলবাবু পড়িয়ে ফিরে এসে বরাবর ওপরে গেল উঠে। সুধার ঘর খোলা। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলে, সুধা।

ভেতর থেকে সাদর অভ্যর্থনা এলো।

—আসুন, পরিমলদা'—ভেতরে আসুন।

—কি ব্যাপার—শুয়ে পড়েছ না কি ?

—রাতটুকু তো মানুষের শোবার জন্যেই, পরিমলদা'।

—তা বটে—শরীর গতিক খারাপ নয় তো কিছু ?

—না।

সুধা উঠে বসলো।

জিজ্ঞেস করলে পরিমলবাবু, পড়াতে যাও নি আজ ?

—হ্যাঁ—গেছলুম। এই মাত্র আস্‌ছি।

একখানা চেয়ার টেনে পরিমলবাবু বসে পড়লো।

কি মনে ক'রে সুধা জিজ্ঞেস করলে, ওপরে আমার ঘরে এসে বসেছেন—নীচে বৌদি রাগ করবে না তো ?

—তা একটু করুক। তোমার বৌদির রাগটা আমার সয়ে গেছে। কিন্তু সুধা, তোমার অভিমানটা যে আমার এখনও সইছে না।

—আমি আবার আপনার ওপর অভিমান করলুম কবে ?

পরিমলবাবু হেসে বললেন, তোমরা কি আমাদের মুখে ব'লে জানিয়ে রাখো যে—আজ থেকে রাগ অভিমান করলুম। তা তো রাখো না—ওটা আমাদের বুঝে নিতে হয়।

—তাই বুঝি আজ এসেছেন আমার রাগ অভিমান দূর ক'রে দিতে ?

—এসেছি, এটা সত্যি। কিন্তু তোমার রাগ অভিমান দূর ক'রতে কি আরও বাড়াতে—তাতো ব'লতে পারি না, সুধা।

সুধা চুপ ক'রে রইলো। তা'র তখন কেবলি মনে হচ্ছিল—পরিমলবাবুর বুকের ওপর একবারটি হা-হা ক'রে কেঁদে আছড়ে পড়ে। অশ্রুরুদ্ধ অভিমানের আবেগটা ভেতরে যেন ফুলে ফুলে উঠছিল।

কথার প্রসঙ্গ ঘোরালে পরিমলবাবু। জিজ্ঞেস করলে, সুধা, শুনছি নাকি—বনমালী শিকদার তোমাদের এ বাড়ির সবটুকু কিনে নিচ্ছে।

—আমিও তাই শুনিছি, পরিমলদা'। আমার কাছেও লোক এসেছিল।

—তাই না কি! কি বললে তুমি?

—আমি আর কি বলবো? বাড়ির অংশ তো আর আমার নয়—কনকই এর মালিক—সে যা ভালো বুঝবে, তাই করবে। বেচতে হয় বেচবে—রাখতে হয় রাখবে। এই কথাই ব'লে দিলুম।

—তা বেশ করেছ।

—এখন শুনছি নাকি—যুদ্ধের বাজারে জায়গা জমি বাড়ি ঘরের দর খুব উঠেছে। যদি বেচতেই হয়—তো এই বেলায় বেচা ভালো—দর পাবে।

—তা পাবে। কিন্তু বাড়ি বেচে ফেললে—তোমরা ভাই বোনে থাকবে কোথায়?

—এত বড় পৃথিবীতে—থাকবার জায়গার অভাব হবে কি, পরিমলদা'? দেখা যাক্—কি হয়। হ্যাঁ—ভালো কথা—কনকের এতদিন পরে চিঠি এসেছে।

—চিঠি এসেছে—তারপর কি খবর কনকের?

—আমার নামেই চিঠি দিয়েছে বম্বে থেকে। হাতে আর একটাও

পয়সা নেই। 'ফিল্ম্ আর্টিষ্ট্' হ'তে পারে নি। ওখানে একটা হোটেলে কাজ করছে। এক শ' টাকা পাঠাতে বলেছে। চলে আসবে শীগ্গীর।

—বটে। বেশ—তা'কে জানিয়ে দিয়েছ—মাসীমা মারা গেছেন?

—তা দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এক শ' টাকা মনিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়েও দিয়েছি।

পরিমলবাবু একটু ভেবে বললে, শেষ পর্য্যন্ত ঐ এক শ' টাকা হাতে পেয়ে সেখানে নয়-ছয় করবে না তো! তারপর আবার কাঁদুনি গেয়ে টাকা চাইবে।

—তা নয়-ছয় করে করুক। টাকা ফের চেয়ে পাঠালে—আমি আর পাবো কোথায় বলুন?

জিজ্ঞেস করলে পরিমলবাবু, এ একশ' টাকা তুমি পেলে কোত্থেকে? আমার কাছ থেকে তো ভাড়ার টাকা তুমি এক পয়সাও নাও না—মাসীমা মারা যাবার পর থেকেই।

—মার অসুখে অনেক টাকা দেনা রয়েছে আপনার কাছে। সেটা আগে পরিশোধ হ'য়ে যাক। হ'য়ে গেলে ঘরভাড়া নব'খন। এখন আমার হাতে যা ছিল কুড়িয়ে বাড়িয়ে, আর আমার গলার সেই সোনার হারছড়াটা বেচে দিয়ে, কনককে টাকা পাঠিয়েছি। এর পর আবার চাইলে—পাঠাবো কেমন ক'রে—পাবো কোথায়?

পরিমলবাবু লক্ষ্য করলে, সুধার গলায় সেই হারছড়াটা সত্যিই নেই আর। খালি সাদা গলাটা কেমন নেড়া নেড়া দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে, শেষ পর্য্যন্ত হারছড়াটা বেচেই ফেললে!

—ও রেখে কি আর হবে! টাকা পেয়ে কনক যদি ফিরে আসে—ভালোই। আর যদি নাও আসে—তাতেও আমার আক্ষেপের কিছু নেই, পরিমলদা'। তবে তা'কে লিখে দিয়েছি, বাড়ির অংশ যদি

বেচতে চাও তো চলে এস'—অন্য শরিকদার সকলেই বেচে ফেলছে—দর বেশ ভালোই পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিক সেই সময় পরিমলবাবুর মেয়ে রেবা নীচে থেকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, বাবা—বাবা—খাবার দিয়েছে—খাবে এস'—মা ডাকছে।

ডাক শুনে পরিমলবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সুধার হাতখানা ধ'রে তা'কে কাছে টেনে এনে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললে, সুধা, একটা কথা আজ তোমায় ব'লে যাই। কোনদিন বলা হয় নি—বলি বলি ক'রেও। দেখ—তোমার বৌদির কথায় ব্যাভারে তুমি মনে রাগ অভিমান যেন কিছু কর' না। আর এটা জেনে রেখ', মানুষের আশা ভালোবাসা যত বড় হয়, তা'র আঘাতটাও ঠিক তত গুরু হয়ে ওঠে। ঘা খেলেই যদি বারে বারে মাথাটা নুয়ে নুয়ে থাকতে হয়, তা'হলে বুঝতে হবে—আঘাতটাই তোমায় কাবু করেছে—তুমি পারো নি আঘাতটাকে জব্দ করতে। তোমাকে আমি স্নেহ করি—ভালোবাসি। সুধা, আমি চাই—তুমি শক্ত হও—দৃঢ় হও—কঠোরে কোমলে মিশে তোমার জীবন মধুর হ'য়ে উঠুক।

একটা বিরাট স্নেহের পক্ষপুটে ছোট পাখীর ছানার মত সুধা থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। পরিমলবাবুর এ প্রীতিস্নিগ্ধ পরশ সুধা কোনদিন পায় নি। এটুকু পাবার জন্যে সে যেন হন্যে হয়েছিল মনে মনে—কিন্তু পায় নি কোনদিনই। একটা সব-ভোলা সর্ব্বনাশা আনন্দের আমেজ থেকে থেকে জেগে উঠতে লাগলো সুধার সর্ব্ব শরীরে। পুলক শিহরণ কি একেই বলে—তা' হবে! কিন্তু এ কি করলে পরিমলবাবু! এইটুকু সুধাকে বুকের কাছে স্বেচ্ছায় টেনে আবার সরিয়ে দিলে কেন! একটা বিমূঢ় দাহ যে ছড়িয়ে পড়লো

সুধার দেহে মনে প্রাণে। যেটুকু সংযম-শক্তি ছিল, সেটুকু যে একেবারে ভেঙে পড়লো খান্ খান্ হ'য়ে। সুধার আর চলৎ-শক্তি ছিল না। পরিমলবাবু চলে গেলে সে তা'র দেহটাকে কোনও মতে জোর ক'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল শয্যার পার্শ্বে। তারপর কেমন এলিয়ে পড়লো তারির ওপর। প্রাণপণ বলে সুধা সামলাতে লাগলো শুয়ে প'ড়ে। কিন্তু এ কি সামলানো যায়—সামলাবার কি এ! পরিমলবাবুর হাতের পরশ যে ফুটে উঠছে তার সর্ব্বাঙ্গে! যাতনায় উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে যে সুধার ভেতরটা! এ সুখ সে কেমন ক'রে সহ্য করবে? এ দুঃখ সে ভুলবেই বা কেমন করে? এর নিবৃত্তি কৈ—এর প্রশান্তি কোথায়! পরিমলবাবুর আশীর্ব্বাদ—সে যে দারুণ জ্বলন্ত অনলবর্ষী অভিশাপ হ'য়ে দাঁড়ালো সুধার!

পাগলা ক্ষ্যাপা ঘোড়া দেখেছ কি কখনো উর্দ্ধঃশ্বাসে ছুটে চলতে—পেছনে নিয়ে যাত্রীবোঝাই গাড়ী? দেখেছ কি সে-সময় ওস্তাদ গাড়োয়ানকে কষে টেনে ধ'রতে ঘোড়ার লাগামটাকে একেবারে পিছন দিকে শুয়ে পড়ে? সুধার অবস্থা ঠিক তাই। মন তা'র সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেঙে চুরমার ক'রে আপন খেয়ালে দৌড়ে ছুটে চলতে চায়—সুধা সেই ক্ষিপ্ত মনকে নিয়ে তারির সঙ্গে যুঝতে লাগলো প্রাণপণ শক্তি খরচ ক'রে!

সুধার তৈরি খাবার চাপা দেওয়া আছে। সারারাত চাপা দেওয়াই রইলো। আর উঠে খেতে হ'লো না তা'কে। যেটুক খাইয়ে গেছে পরিমলবাবু, সেইটুকুই যে তা'র শেষে ভুরি ভোজন হ'য়ে উঠলো। আর খাবে কেমন ক'রে? কেউ কি খেতে পারে আর!

সারারাত ঘুম নামলো না সুধার চোখে। কি যে ভাবে—কি যে চিন্তা করে—তা জানি নে। শেষে ঠিক করলে, নাঃ—এ রকম ভাবে থাকা চলবে না। জীবনে এর চেয়ে বড় অপমানকর ব্যর্থতা আর

নেই। একেবারে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে, আকাশ বাতাস রাঙিয়ে নিবে আসা ভালো ; ভালো নয় এ তিল তিল দহন—অণুতে অণুতে পেষণ। পরিমলবাবুকে সপরিবারে ঘর ছেড়ে চ'লে যেতেই সে বলবে। সারা বোস বাড়িতে তা'র কলঙ্কের গুঞ্জন উঠেছে বেশ মুখর হ'য়ে। এ সব শুনে পরিমলবাবুর উচিত নয় আর একদিনও এখানে থাকা। এ কথা সুধা কালই পরিমলবাবুকে স্পষ্টই ব'লে দেবে—আর নয়! না—পরিমলবাবুকে বলবে না। বলবে তরুবালাকে। অন্ততঃ একটা ছোবল সে দেবেই। বিষ সে একটু ঢালবেই—না ঢেলে সে ক্ষান্ত হ'তে পারবে না—কিছুতেই না।

সুধার সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় আমিই কেমন যেন সে রাতে একটু কেঁপে উঠেছিলুম। এ কি পারবে সুধা? তা হয়তো পারবে! ওরা জীবনে মরণে কি যে পারে আর কি যে পারে না—তা আমি এতকাল দেখে শুনে জানতে বুঝতে শিখতে কিছুই পারলুম না! তবু চেয়ে থাকি বেশি ক'রে ওদের দিকেই। কি অতল রহস্যে ভরা ওদের বুকখানা! কত কবি কত কথাই না ব'লে গেছেন ওদের নিয়ে। কত কাব্য—কত কাহিনী—কত রচনা! কিন্তু হায়, মনে হয়—সে সমস্ত একত্র ক'রে ওদের সে রহস্য-মায়াজালের একটা ফাঁসও খুলতে পারা যায় নি আজও! সেই চিররহস্যময়ী নারী—সৃষ্টির প্রারম্ভে যা ছিল, আজও ঠিক তাই-ই আছে! আমরা বলেছি—ওরা শুনেছে; আমরা হেসেছি—ওরা কেঁদেছে; আমরা ডেকেছি যুগে যুগে—ওরা যুগে যুগে এসেছে। এসেছে নতাননে—অমৃতকুম্ভ কক্ষে নিয়ে—জ্বেলেছে সাঁঝের প্রদীপ ঘরে ঘরে! আবার গিয়েছে ফিরে বারে বারে হতাদরে—নিয়ে গেছে সাথে ক'রে, বয়ে-আনা আপনার দুর্জ্ঞেয় রহস্য—অমীমাংসিত র'য়ে গেল যা' আজও পুরুষের!

অন্ধকার থাকতেই সেদিন ল্যাম্পপোস্টের আলো নিবিয়ে দিয়ে গেল লোকটা। সে অমন রোজ দিয়ে যায় নিবিয়ে। সারা রাত চেয়ে চেয়ে ক্লান্তিতে যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল ল্যাম্পপোস্টটা। কেমন যেন একটু আচ্ছন্ন ভাব এসেছিল। সকাল হয় হয়। বেশ আলো ফুটে গেছে চারদিকে। সংসারের কোলাহল সবেমাত্র সুরু হয়েছে ঘরে ঘরে। বনমালী শিকদারের বাড়িতে তখনও তেমন কেউ জাগে নি। মাত্র কয়েকটা ঝি চাকর ঘর দালান ধুতে মুছতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ওরা একটু ভোর থাকতেই উঠে পড়ে। এমন সময় 'য়্যাম্বুলেন্স' গাড়ী এসে দাঁড়ালো বনমালী শিকদারের বাড়ির সামনে। একটা হাঁক ডাক পড়ে গেল সদরে। ভবেশ পালিত 'য়্যাম্বুলেন্স' গাড়ী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে জোর গলায় ডাকতে লাগলো, শিববাবু—শিববাবু—

তন্দ্রার ঘোরটুকু কেটে গেল ল্যাম্পপোস্টটার। কি হ'লো—ব্যাপার কি! এই সকাল বেলায় বনমালী শিকদারের ফটকে 'য়্যাম্বুলেন্স' গাড়ী এসে দাঁড়ালো কেন?

ডাক শুনে শিবপদবাবু বেরিয়ে এলেন। বিছানা থেকে টাট্‌কা ওঠা। মুখে চোখে জল দেন নি তখনও। মুখ চোখ তাই ফোলা-ফোলা। পরণের বিস্রস্ত কাপড়খানা কোনও রকমে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে ফটকের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন শিবপদবাবু, কি হয়েছে—পালিত মশাই—কি হয়েছে! হঠাৎ এ অবস্থায় ফিরে এলেন যে!

ভবেশ পালিত বললে, বলছি সব—আগে ওপরের দোতলার ঘরে বিছানা ঠিক করতে বলুন। স্বয়ং শিকদার মশাই য়্যাম্বুলেন্সের ভেতর আছেন। কাল থেকে বিপদ যাচ্ছে খুব।

দারুণ বিস্ময়ে হক্‌চকিয়ে উঠলেন শিবপদবাবু। 'কি হয়েছে—কি হয়েছে'—ব'লে য়্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটে গেলেন। ভীষণ সাড়া প'ড়ে গেল শিকদার বাড়িতে। যে যেখানে ছিল—সকলে ছুটে এলো বাইরে দরজার নিকটে। এলো একবার প্রমীলাও।

সকলে মিলে ধরাধরি ক'রে বনমালী শিকদারকে য়্যাম্বুলেন্স থেকে নামিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। দোতলার বৈঠকখানাঘরে শুইয়ে দিলে বিছানার ওপর। বনমালী শিকদারের রাঁচিতে 'ব্লড্ প্রেশার' (Blood Pressure) বেড়েছিল খুব। দু'দিন আগে ওখানেই চলন্ত গাড়ীর মধ্যে কেমন ব'সে থেকেই মুখ থুবড়ে পড়ে যায় বনমালী শিকদার। সঙ্গে সহযাত্রী ছিল ভবেশ পালিত। তারপর ওখানকার বড় বড় ডাক্তার এ দু'দিন চিকিৎসা করেন। বনমালী শিকদারের ডান দিকটা সম্পূর্ণ প'ড়ে গেছে। বোধ হয় পক্ষাঘাত। বত্রিশ ঘণ্টা সমানে অজ্ঞান হয়ে ছিল। কথা বলতে পারে নি কিছু। তারপর জ্ঞান আসে। একটু একটু কথা বলে। ডাক্তাররা বললেন—শীগ্‌গীর কলকাতায় নিয়ে যেতে। ভালো চিকিৎসা করালে এই বেলা—হয়তো সারতে পারে; সারবার আশা নেই যদিও। তাই আর কালবিলম্ব না ক'রে ভবেশ পালিত বনমালী শিকদারকে কোনও রকমে কলকাতায় নিয়ে আসতে পেরেছে। তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা হ'লো চিকিৎসার। বড় ডাক্তার ডেকে আনলেন শিবপদবাবু। ডাক্তার দেখে শুনে বললেন—পক্ষাঘাত। ডান দিকটায় কোন সাড় নেই। ক্ষমতা নেই উঠে বসবার—নড়বার চড়বার। চিকিৎসা চলতে লাগলো দস্তুরমত। সে বিষয়ে ত্রুটি হ'লো না কিছু। আনা হ'লো

দু'জন নার্স। বনমালী শিকদারকে সেবা করবে তা'রা। বড় বড় দু'তিনজন ডাক্তার তো দেখতে লাগলেনই। পয়সা আছে বনমালী শিকদারের—তখন চিকিৎসা ভালোমত কেনই বা না হবে। বনমালী শিকদারের সিন্দুকভর্ত্তি টাকা যেন হাঁপিয়ে উঠছিল বদ্ধ থেকে। বেরুবার পথ পাচ্ছিল না কিছুতে। এবার যেন পথ পেলে একটা। হুড়্‌হুড়্‌ ক'রে বেরুতে লাগলো রুদ্ধ জলস্রোতের মত। পয়সাওলা লোকের পয়সা বিপদে আপদে ছড়িয়ে পড়ে চারিধারে। একটা বড়লোকের সময় খারাপ এলে—পাঁচটা সাধারণ লোকের সময় আসে ভালো। তা'রা কিছু ক'রে নেবার সুযোগ পায় এতে। এ ক্ষেত্রেও সে নিয়ম খাটলো—বাদ পড়লো না কিছু।

ভালো বুঝছে না বাড়ির সকলে। বনমালী শিকদার চুপ ক'রে শুয়েই থাকে—কথা বেশি কইতে পারে না। চিকিৎসা চলতে লাগলো সমানে।

শিবপদবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন একদিন প্রমীলাকে, মা—আপনি কি বলেন? কেষ্টনগরে একবার খবর দেওয়া উচিত নয় এ অবস্থায়? শিকদার মশা'য়ের ছেলে মেয়ে পরিবারকে এ সময়ে—

প্রমীলার সঙ্গে বনমালী শিকদারের সম্পর্কটা শিবপদবাবুর জানা আছে বহুদিনই।

প্রমীলা অমনি বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, সে কি শিববাবু—আজ তিন দিন হ'লো—এখনও কেষ্টনগরে খবর পাঠান নি কিছু?

শিবপদবাবু বললেন, আমি তো এ ব্যাপারে নিজে থেকে কিছু ক'রতে পারি না। শিকদার মশাইকে জিজ্ঞেস করলে—উনিও কিছু বলতে পারেন না। তখন আপনার হুকুমটা নেওয়া আমার দরকার। তাই অনেক ভেবে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আপনি এখন মত দিলেই আমি লোক পাঠাই।

প্রমীলা বললে, শিববাবু, আর মুহূর্ত্ত দেরি করবেন না। এক্ষুণি লোক পাঠান কেষ্টনগরে। শিকদার মশা'য়ের ছেলে মেয়ে পরিবারকে আজই নিয়ে আসুক এখানে।

তারপর দু'জন লোক ছুটলো কেষ্টনগরে।

প্রমীলার শান্তি নেই। ভোগ বিলাসে আর মন নেই তা'র। ভেতরটা তা'র তোলপাড় ক'রে উঠছে আজ ক'দিন ধ'রে। আগুনে ঝলসানো ফুলের মত তা'র চুপসে গেছে দেহ মন। পন্টু প্রায়ই আসে তা'র কাছে—'মা' ব'লে ডাকে। তাইতে যেন শান্তি পায় একটু। একটু নয় অনেকখানি। শ্রীনাথ ময়রা আর এদিকে আসে না। 'হা গোবিন্দ, দয়া কর'—এ ডাক শুনতে পাওয়া যায় না আর। উল্টোডিঙির বস্তিতে কোথায় আছে—কেমন আছে—কে জানে!

সন্ধ্যার পর দেখলুম চেয়ে, প্রমীলা ঢুকলো বৈঠকখানা ঘরে। ধীরে ধীরে গিয়ে বসলো বনমালী শিকদারের মাথার কাছে। মুখ তা'র বিরস মলিন। একটা চিন্তার দাবদাহ চলছে যেন অবিরল তা'র মনে মনে। এ সব কিছু ভালো লাগছে না তা'র। এ ঐশ্বর্য্য তা'কে যেন সুচের মুখে বিঁধছে দিন রাত। নার্স দু'জন সেবা ক'রে চলেছে বনমালী শিকদারকে। প্রমীলার আর প্রয়োজন নেই সেবা করবার। খাঁচার পাখীর মত থাকতে হয়—আছে; কিন্তু ভালো লাগছে না কিছু। একটা ভীষণ তিক্ততায় প্রমীলার ভ'রে উঠলো যেন সারা

জীবনটা! বেশ গেছে—ভূষা গেছে—সাজ গেছে—সজ্জা গেছে! ঘুমুতে পারে না রাতে—আহারে রুচি নেই তেমন। একটা চাপা মর্ম্মন্তুদ হাহাকার যেন মূর্ত্তি ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনমালী শিকদারের বাড়িতে। সারাক্ষণ ব'সে থাকে বৈঠকখানার জানলার ধারে। চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে। দেখে—পল্টু তার আসছে কি না!

বনমালী শিকদার জিজ্ঞেস করলে, প্রমীলা, তোমার চেহারা এমন হ'য়ে গেল কেন? এ যে আর চোখে দেখা যায় না।

প্রমীলা বললে, আর দেখ' না।

—আমার জন্যে ভাবছো? ভেব' না—কোন ভয় নেই—ডাক্তারে ব'লে গেছে, আমি সেরে উঠবো।

কেমন উদাস ভাবে বললে প্রমীলা, বেশ—তাই সেরে ওঠ।

বনমালী শিকদার ডাকলে প্রমীলার হাতখানা চেপে ধ'রে, প্রমীলা—প্রমীলা—কি দেখছ জানলার দিকে চেয়ে?

দীর্ঘশ্বাস পড়লো প্রমীলার। বললে, কিছু না।

আজ দু'দিন পল্টু আসে নি তা'র কাছে। কেমন উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে প্রমীলার মনটা! এই সময় সে আসে। প্রমীলা চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাই পথের পানে।

বনমালী শিকদার প্রমীলার নরম হাতে চাপ দিলে একটু। প্রমীলা হাতখানা সরিয়ে নিলে।

জিজ্ঞেস করলে বনমালী, কি—হ'লো কি তোমার, প্রমীলা?

—কিছু না।

বেশ ছোট সংক্ষিপ্ত উত্তর। ব্যথায় ভরা উত্তরটি! বেদনায় টন্‌-টন্‌ করছে তা'র প্রতিটি অক্ষর!

ঠিক এমন সময় পল্টু কাঁদতে কাঁদতে ঝড়ের মত ঢুকে পড়লো ঘরে। ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠে দাঁড়ালো প্রমীলা। পল্টুর এ ঘর

চেনা হ'য়ে গেছে। যখন আসে—এই ঘরেই সে প্রমীলাকে দেখতে পায়। প্রমীলা ব্যথা-ভরা বুকখানা নিয়ে এই ঘরেই যে অপেক্ষা করে তা'র জন্যে।

তাড়াতাড়ি কোলের কাছে পল্টুকে টেনে নিয়ে প্রমীলা ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রে উঠলো বার বার, কি হয়েছে, বাবা—কি হয়েছে, বাবা?

কাঁদতে কাঁদতে পল্টু বললে, মা—আমার বাবা আর বাঁচবে না। দিদি কাঁদছে—বাবা কাঁদছে—

—কেন… কেন—কি হয়েছে—কি হয়েছে?

পল্টু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলো, বাবা চোখে দেখতে পায় না। আজ দু'দিন আগে রাতের বেলায় বাবা কলতলায় যেতে যেতে প'ড়ে গেছলো—মাথা ফেটে গেছে। অনেক রক্ত বেরিয়েছে। চোখ মুখ সব ফুলে গেছে বাবার—বস্তির ডাক্তারবাবু বললেন কি যেন দিদিকে। দিদি সেই থেকে কাঁদছে! সবাই বলছে—বাবা আর বাঁচবে না।

—অ্যাঁ—সে কি! চলো, বাবা—আমায় নিয়ে চলো। আমায় নিয়ে চলো সেখানে।

—তুমি যাবে, মা, আমার বাবাকে দেখতে?

—হ্যাঁ—আমি যাবো, বাবা—এক্ষুণি যাবো তোমার সঙ্গে।

কি একটা জ্বালায় যেন অস্থির হ'য়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলো প্রমীলার বুকখানা। মুখে সে আর কিছু প্রকাশ করলে না। তৎক্ষণাৎ পল্টুকে কোলে তুলে নিলে। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত সেই অবস্থায় বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্‌ ক'রে নীচেয় নেমে চললো।

বনমালী শিকদার ডাকতে লাগলো, প্রমীলা—প্রমীলা—কোথায় চললে অমন ক'রে ? এ ছেলেটা কে—ছেলেটা কে—

সে কথার উত্তর দিলে না প্রমীলা। আর তা'র উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন নেই। বনমালী শিকদারের ডাকে উত্তর দেবার পালা বুঝি এতদিনে শেষ হ'লো প্রমীলার। পণ্টুকে বুকে চেপে ধ'রে প্রমীলা এক রকম ছুটে চললো বাড়ির ফটকের দিকে।

বনমালী শিকদারের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এসে গেছে কেষ্টনগর থেকে। তা'রা সব মোটর থেকে নামছে। শিবপদবাবু নামাচ্ছেন তাদের। জিনিষ পত্তর নামানো হ'য়ে গেছে আগেই। ফটকের কাছে বাক্স তোরঙ্গ সব জমা হ'য়ে রয়েছে। শিবপদবাবু দেখতে পেলেন প্রমীলাকে এক রকম ছুটে চ'লে যেতে, ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে। কিছু জানতে বুঝতে পারলেন না—তাই বল'তেও পারলেন না কিছু।

থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছিল প্রমীলার সারা দেহখানা একটা অব্যক্ত আবেগে। এই ল্যাম্পপোস্টটার কাছে আসতেই পণ্টু বললে, মা—আমি চ'লে যেতে পারবো—আমায় কোল থেকে নামিয়ে দাও, মা।

প্রমীলা দিলে নামিয়ে কোল থেকে পণ্টুকে। তারপর যেমন ভাবে পণ্টু তা'র অন্ধ বাপ শ্রীনাথ ময়রার হাত ধ'রে পথ হেঁটে চলতো—ঠিক সেই রকম ভাবে সেদিন পণ্টু প্রমীলার হাতখানা ধ'রে, তা'র মাকে এই জগৎ-সংসারের বুকে, কল-কোলাহলে পূর্ণ অন্ধকারের মাঝে পথ দেখিয়ে চলতে লাগলো দ্রুতপদক্ষেপে! চলে গেল তা'রা উল্টোডিঙির বস্তির দিকে। আর একটুও কাঁপলো না প্রমীলার গা—পা দু'টো তা'র আর টললো না একটুও!

একটু নিঃশ্বাস ফেলে দম নেবো কি—চোখ ফেরাতেই দেখি খালি ট্যাক্সি একখানা এসে দাঁড়িয়েছে বোস বাড়ির দরজায়। সুধা ডেকে আনিয়েছে। তা'র বেডিং সুট্‌কেশ তুলে দিয়েছে গাড়িতে। সুধা যাবে ট্যাক্সিতে। ওপরের ঘর বন্ধ ক'রে তালা চাবি দিয়ে নেমে এলো সুধা। যাত্রার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হ'য়েই সুধা নামলো। পরিমলবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে সুধা ডাকলে, পরিমলদা'—পরিমলদা'—

পরিমলবাবু সেদিন ঘরেই ছিল। ডাক শুনে বেরিয়ে এলো। পেছন পেছন এসে দাঁড়ালো তরুবালাও। সুধাকে আপাদ-মস্তক দেখে জিজ্ঞেস করলে পরিমলবাবু, একি—গোছগাছ ক'রে কোথায় চললে, সুধা ?

সুধা বললে, পরিমলদা'—গিরিডির গার্ল্‌স্ স্কুলে মাষ্টারী পেয়েছি। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখি—ওরা একজন গ্র্যাজুয়েট্ সেকেণ্ড মিষ্ট্রেস্ চায়। কি মনে ক'রে একখানা আবেদন পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। তা'র জবাব এসেছে—তা'রা আমাকেই মনোনীত করেছে ; তাই আজ চ'লে যাচ্ছি সেখানে।

মুহূর্ত্তে কেমন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল পরিমলবাবু। পরক্ষণেই বেশ সহজ সরল কণ্ঠে হাসিমুখে ব'লে উঠলো, বেশ—বেশ—খুব ভালো হয়েছে, সুধা—খুব ভালো হয়েছে।

সুধা বললে, এতদিন অনেক জ্বালিয়েছি—আর একটু জ্বালাবো আপনাকে, পরিমলদা'। কনক আসবে লিখেছে ; কিন্তু আমার

আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। পরশু থেকে স্কুলে 'জয়েন' ক'রতে হবে। তাই—ওপরের ঘরের এই চাবিটা কনক এলে কনকের হাতে দিয়ে দেবেন।

এই ব'লে সুধা পরিমলবাবুর হাতে ঘরের চাবিটা দিয়ে দিলে। তারপর পরিমলবাবুকে প্রণাম ক'রে তা'র পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে সুধা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আশীর্ব্বাদ করুন, পরিমলদা।'—সেখানে আমার কর্ত্তব্যটুকু আমি যেন ভালো ভাবে ক'রে যেতে পারি।

পরিমলবাবু বললে, নিশ্চয়—নিশ্চয়—খুব পারবে তুমি, সুধা, খুব পারবে। সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, সুধা—শুধু এ যাত্রা নয়, তোমার জীবনযাত্রা যেন সকল রকমে জয়যুক্ত হয়। দাঁড়াও একটু—আসছি—আসছি ঘর থেকে।

পরিমলবাবু ঘরের ভেতর চলে গেল।

সুধা তরুবালাকে নমস্কার করলে। বললে, কিছু মনে কর' না, বৌদি—চললুম।

তরুবালার মুখে কোন কথা বেরুলো না। সে কেমন যেন হতভম্বের মত নির্ব্বাকে দাঁড়িয়ে রইলো। পরিমলবাবুর ছেলে মেয়ের কাছেও বিদায় নিলে সুধা। তাদের এক এক ক'রে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলে।

পরিমলবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হাতের মুঠিতে তা'র কি একটা জিনিষ লুকোন। বললে, সুধা—আমার কাছে এগিয়ে এস তো একটু।

সুধা এগিয়ে গেল। এক ছড়া নতুন সোনার হার সুধার গলায় পরিয়ে দিতে দিতে পরিমলবাবু বললে, সুধা—আজ তিন দিন হ'লো

এই হারছাড়াটা তৈরি ক'রে এনেছি তোমার জন্যে। একটু সময় করতে পারছি না—ওপরে গিয়ে তোমার গলায় পরিয়ে দিয়ে আসবো। গলাটা তোমার বড় খালি খালি দেখাচ্ছে যে! বাঃ—এইবার বেশ হয়েছে—বেশ মানিয়েছে, সুধা!

তরুবালার সামনেই সুধার গলায় নতুন হারছড়াটা পরিয়ে দিলে পরিমলবাবু। সুধার মুখের পানে চাইতেই একটা আনন্দের উচ্ছ্বাসে পরিমলবাবুর সারা মুখখানা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। সুধার ভেতরটা তোলপাড় ক'রতে লাগলো। অনেক কথা যেন বলবার ইচ্ছা হচ্ছিল—কিন্তু বলতে পারছিল না। যাবার সময় আর একবার পরিমলবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণামটুকু সেরে ম্লান হাসি হেসে বললে, চল্‌লুম এখন।

সুধার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রতে ক'রতে বললে পরিমলবাবু, এস'।

এতক্ষণ তরুবালা কিছু ব'লতে পারে নি। আর থাক্‌তে না পেরে বললে, পৌঁছে চিঠি দিও, সুধা।

সুধা হাসতে হাসতে বললে, দোব—বৌদি।

ট্যাক্সি আর দাঁড়ালো না। স্টার্ট দিতেই দেখতে পেলুম সুধার দু'চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে চোখের জল ঝ'রে পড়ছে—ঠিক যেমনি ক'রে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে হেমন্তের প্রভাত-বাতাসে মুক্তার মত শিশিরবিন্দু ঝরা শেফালির সাথে সাথে!

সে রাতটা আমি ভুলি নি আজও। ভোলবার রাত সে নয়। বেশ মনে আছে—অমাবস্যার রাত। আকাশের গায়ে অজস্র নক্ষত্রকণা। চাঁদের আলো নেই সেখানে। কিন্তু এখানে এই

পৃথিবীর মাটির বুকে সেদিন সে-রাতে মানুষের বুকের আলোয় আমার চারিপাশ যেন ঝলমল্ ক'রে উঠেছিল—সেই মধুর সন্ধ্যার পর থেকেই !

ঐ যাঃ—একি হ'লো ! পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি গ্যাস-কোম্পানির লোক এসেছে কুলিমজুর নিয়ে অনেকগুলো। ল্যাম্প-পোস্টটা তা'রা এরির মধ্যেই খুঁড়ে তুলে ফেলেছে যে ! শুনলুম—আর ও ল্যাম্পপোস্টটা এখানে থাকবে না। রাস্তায় জ্বলবে এবার থেকে ইলেকৃট্রিক্ আলো। বড় পোস্ট তা'র পোতা হয়ে গেছে ক'দিন আগেই—এখান থেকে আর একটু তফাতে। ইলেকৃট্রিক্ আলোর পোস্টটা বেজায় উঁচু ও লম্বা। ওপর দিকে ঘাড় বেঁকানো আছে। যেন আপন ঔদ্ধত্যে ফেটে পড়ছে নগরীর নটীর মত ! চোখের সামনে দিয়ে ল্যাম্পপোস্টটাকে নিয়ে চলে গেল তা'রা। কুলবধূর মুখ দিলে যেন বন্ধ করে ! কত কথাই না এখনও জানবার শোনবার ছিল ল্যাম্পপোস্টটার কাছে ! আর শোনা হ'লো না কিছু ! বাকি রয়ে গেল দেখ্‌ছি অনেকখানি ! তারপর ? তারপর ? এ কথার আর কেই বা দেবে উত্তর ! এ বিরাট ফাঁকটুকু ভরিয়ে তুলবে—এমন আর কে আছে এখানে ! যাঃ—মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেল ! একটা মধুর কাব্যের ছন্দে যেন কর্কশ আঘাত হানলে কে ! মাটির বুকে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের জোছনা এমন ক'রে আড়াল করলে কা'রা ! আহা—আজ যদি থাক্‌তো সেই অতীতের কথা-বলা ছোটখাটো দরদী ল্যাম্পপোস্টটা !!